বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

তাপস মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, জগন্ময় মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, প্রবীর বসু, সৌরভ মুখার্জী

: website :
www.ssu2011.com/bigyan-anneswak

: e-mail :
1.bigyanannesak1993@gmail.com.

: Whatsapp No. :
9874778216 / 9143264159

প্রচ্ছদ বিন্যাস অঙ্গসজ্জা

তাপস মজুমদার

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র — দেবাশিস বিশ্বাস

অঙ্কন — সৌরভ মুখার্জী

সুভাষিতম্

'বৈজ্ঞানিক তাঁর প্রয়োজনের তাগিদে প্রকৃতিকে অনুধাবন করেন না, অনুধাবন করেন আনন্দলাভ করেন বলে এবং আনন্দলাভ করেন প্রকৃতি সুন্দর বলে।'

—হেনরী পঁয়কার

(ফরাসী গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক)

আমাদের কথা

হিমালয় পরিমান ভুল ?

সরকারি মতেই প্রায় ৫ লক্ষ। ভারতে এখনো পর্যন্ত কোভিড ভাইরাসের আক্রমণে মৃত্যু। কিন্তু যে মৃতদেহগুলি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হল কিংবা গণচিতাতে যাদের ঠাঁই হল তাদের হিসাব কোথায়? অনুমান মৃত্যু অনেকগুণ বেশি হবে। প্রশ্ন হল, এই বিপুল মৃত্যু কি অবধারিত ছিল? আক্রমণের প্রথম ঢেউয়ের আগেই কি আমরা জানতাম না এর সংক্রমণ ক্ষমতা? বিজ্ঞান কিন্তু সতর্ক করেছিল। আমরা শুনিনি। দ্বিতীয় ঢেউ এলো আরো প্রবলভাবে। আশ্চর্য, বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ চিন্তাকে সরিয়ে রেখে প্রশাসন ও আমরা সকলে মেতে উঠলাম মেলা ও নির্বাচনে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল, যেন একটি গণিতের সমাধান, অসংখ্য মৃত্যু। বোধহয় ভারতের একটি পরিবারকেও পাওয়া যাবে না যাদের কোন একজন আত্মীয় বা বন্ধু বা চেনাজানাকে কোভিড কেড়ে নেয়নি। এর মধ্যে ভারত হারালো তাঁর উজ্জ্বল রত্নগুলিকে, যাঁদের মধ্যে আছেন—

প্রণব মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি), সুন্দরলাল বহুগুনা (পরিবেশ রক্ষক), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অভিনেতা), অশোক কুমার বড়ুয়া (বিজ্ঞানী), মিলখা সিং (অলিম্পিয়ান দৌড়বীর), শঙ্খ ঘোষ (কবি), ঈশা মহম্মদ (শিল্পী), শ্যামল চক্রবর্তী (শ্রমিক নেতা), ব্রজ রায় (মরণোত্তর দেহদানে পথিকৃত), স্ট্যান স্বামী (সমাজকর্মী), শর্মিষ্ঠা চৌধুরী (গণ-আন্দোলনকর্মী), জগন্নাথ পাহাড়িয়া (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী), অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সাংবাদিক), দেবীপ্রসাদ পাল (আইনজীবী), সুবীর দত্ত (প্যাথ-ল্যাব স্থপতি) এবং আরো আরো অনেকে।

এবং কোভিড ও আমাদের মাঝে যাঁরা প্রাচীর হয়েছিলেন, সেই সব শহীদ ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, সমাজকর্মী সকলেই।

সকলের এই অকাল মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। সকলের জন্য আমাদের নিবেদন অশ্রু-অঞ্জলি।

—তাপস মজুমদার

ISSN 2582-5674

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২/৯২৩১৫৪৫১৯১

জগদীশচন্দ্র বসু

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে

আমাদের বাড়ির নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কূল প্লাবন করিয়া জলস্রোত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার ভাঁটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতি পরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত! যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখনও মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে ইহা তো কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' নদী উত্তর করিত, 'মহাদেবের জটা হইতে।' তখন ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।

তাহার পর বড় হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্ব কথা শুনিতাম 'মহাদেবের জটা হইত।'

একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্ম পরিচিত, বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বাহিয়া চলিয়া গেল? যে যায়, সে তো আর ফিরে না; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি! যে যায়, সে কোথায় যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, 'মহাদেবের পদতলে।'

চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, 'আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাহের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথা হইতে আসিয়াছ, নদী?' নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, 'মহাদেবের জটা হইতে।'

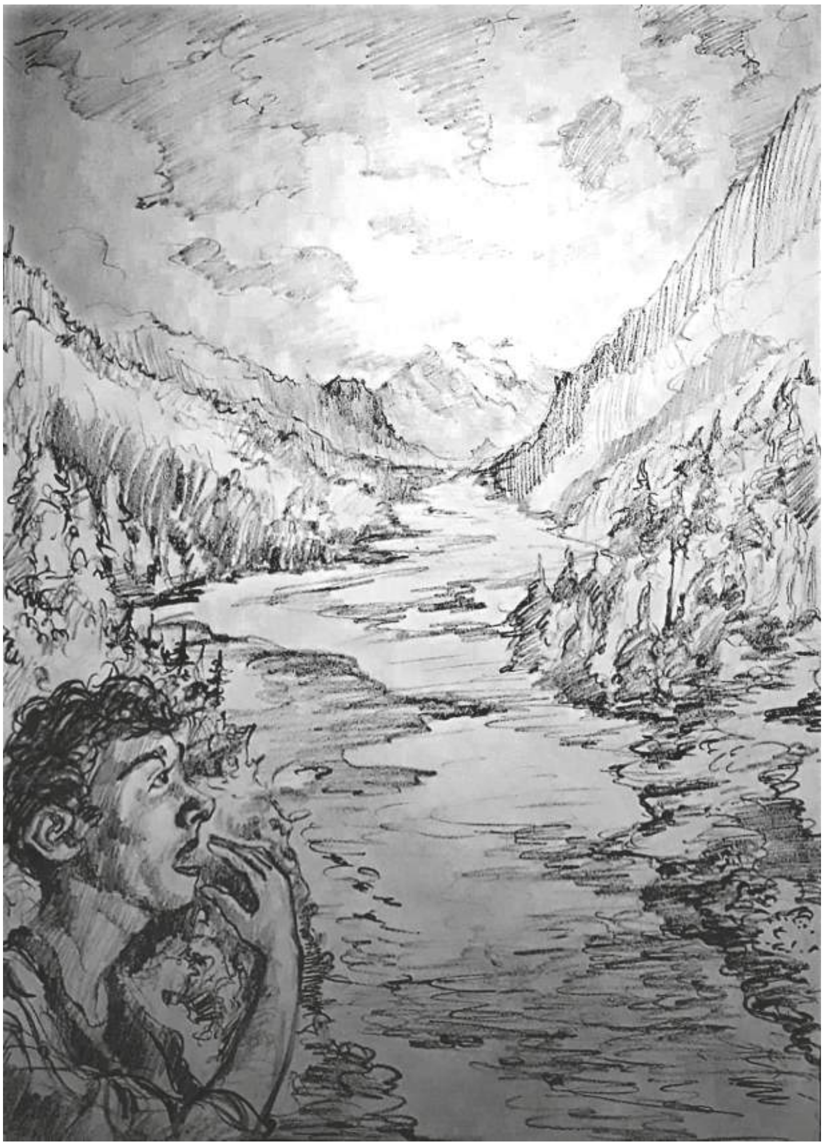

একদিন আমি বলিলাম, 'নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি! বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।'

শুনিয়াছিলাম, উত্তর পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায় তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্মাচল নামক পুরাণ প্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূ নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘনপূর্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া

পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ দ্বারা পশ্চাদের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, 'এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে উহাই বহু দেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী, কূলপ্লাবনী স্রোতস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।'

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'সম্মুখে দেখ, জয় নন্দাদেবী' জয় ত্রিশূল!'

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন

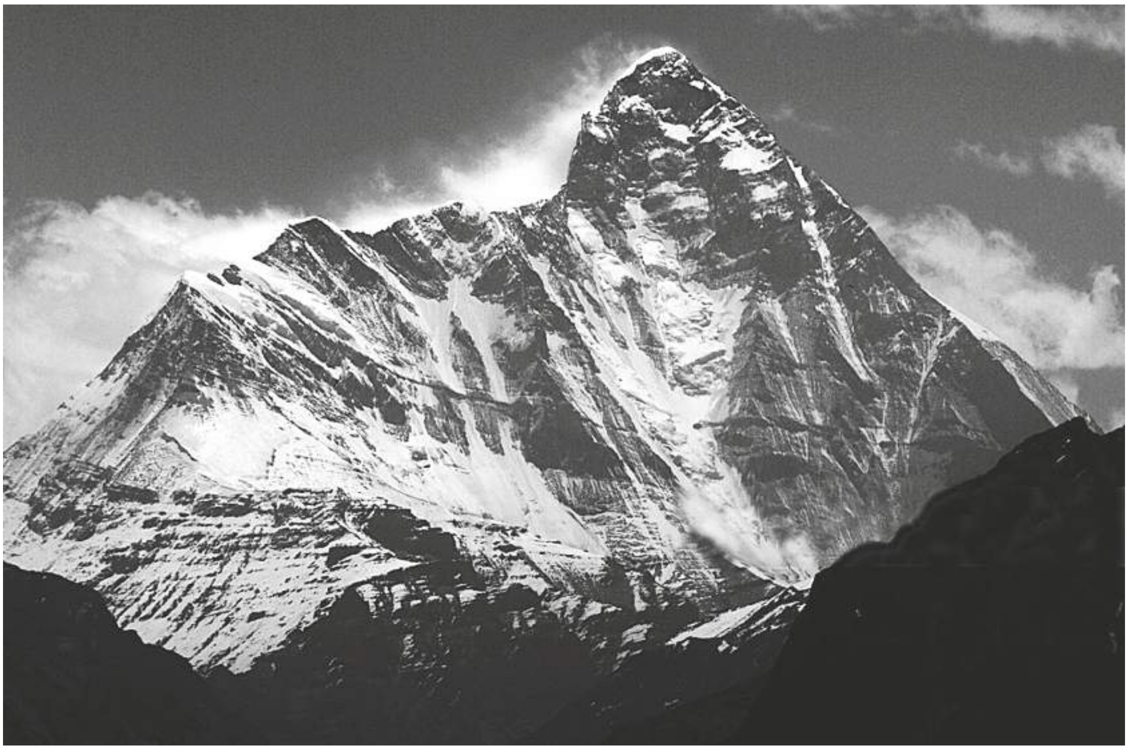

নন্দাদেবী

উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষারমূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়—মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণপূর্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।*

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আয়ুধ, সাকাররূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী, তাহা পরে বুঝিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, 'সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে, উহা অতীব দুর্গম; দুই দিন চলিলে পর তুষার নদী দেখিতে পাইবে।'

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুইদিকে উচ্চ পর্বত-শ্রেণি, বহুদূর প্রসারিত সেই পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখর-তুষার নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার নদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্ধ্বে উঠিতেছি বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতন প্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম—সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই

* কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষার শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষার-পর্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতকক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণি দেখিতেছি, হিমাণুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষার-শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষার-শয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, 'আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নতুন করিয়া নির্মাণ করি।'

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে সেই পর্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোনো পথ ছিল না, পতিত পর্বতখণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল—উপত্যকা রচিত হইল। পর্বতগাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি তাহার উভয়তঃ তুষার-বাহিত প্রস্তরখণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সারিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে একস্থানে উভয় কূলস্থ দেশ মরুভূমি-প্রায় হইয়াছিল। নদীতট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্বতের অস্থিচূর্ণ সংযোগে মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বর্ধিত হইল। কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যামদেহ নির্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নতুন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে।

সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভগ্ন করিতেছে।

জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি স্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎগাররূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; ঊর্ধ্ব ভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হইয়া নতুন মহাদেশ নির্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে

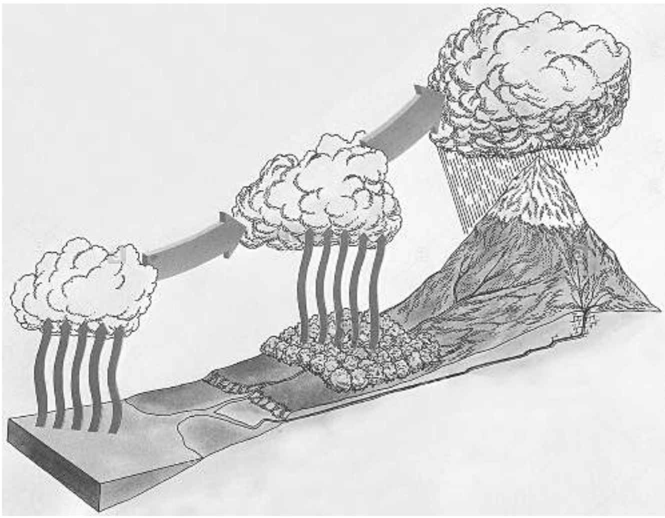

সমুদ্রের জলের বাষ্পীভবনের ফলে মেঘবৃক্ষ তৈরি, যা অতিরিক্ত শৈত্যে বৃষ্টি ও তুষারের উৎপত্তি করে।

উত্তপ্ত হইয়া ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝা বলে পর্বত-শিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজাল মধ্যে আশ্রয় লইবে; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই!

এখনও ভাগীরথী-তীরে বসিয়া তাঁহার কুলকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না।

'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' ইহার উত্তরে এখনও সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—

'মহাদেবের জটা হইতে।'

প্রচ্ছদ কথা ২

রাজদীপ ভট্টাচার্য

হিমালয়ের সৃষ্টিকথা

অভিসারী পাত সীমানা

প্রতিসারী পাত সীমানা

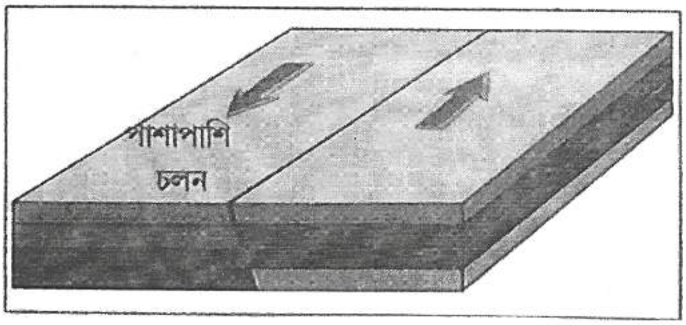

নিরপেক্ষ পাত সীমানা

যদি বলি ২২৫০ লক্ষ বছর আগে ভারতবর্ষ ছিল একটা বড় মাপের দ্বীপ, মেনে নিতে কি খুব কষ্ট হবে? অথচ বিজ্ঞানকে না মেনেও উপায় নেই। সত্যিই তখন আন্টার্কটিকা, আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়ার মাঝে প্রাচীন সমুদ্রের বুকে একটা বিরাট দ্বীপভূমির মতো অবস্থান করছিল আমাদের প্রিয় এই ভূখন্ড। তারপর কী হল জানতে গেলে ভূগোল ও ভূতত্ত্বের কিছু পাঠ নেওয়া আবশ্যিক।

আধুনিক ভূগোল শাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে পাতসংস্থান তত্ত্বের উপর। সহজ করে বললে এই তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর উপরের খোসার মতো স্তরটি অনেক ছোট-মাঝারি-বড় টুকরোয় বিভক্ত। ধরো একটা

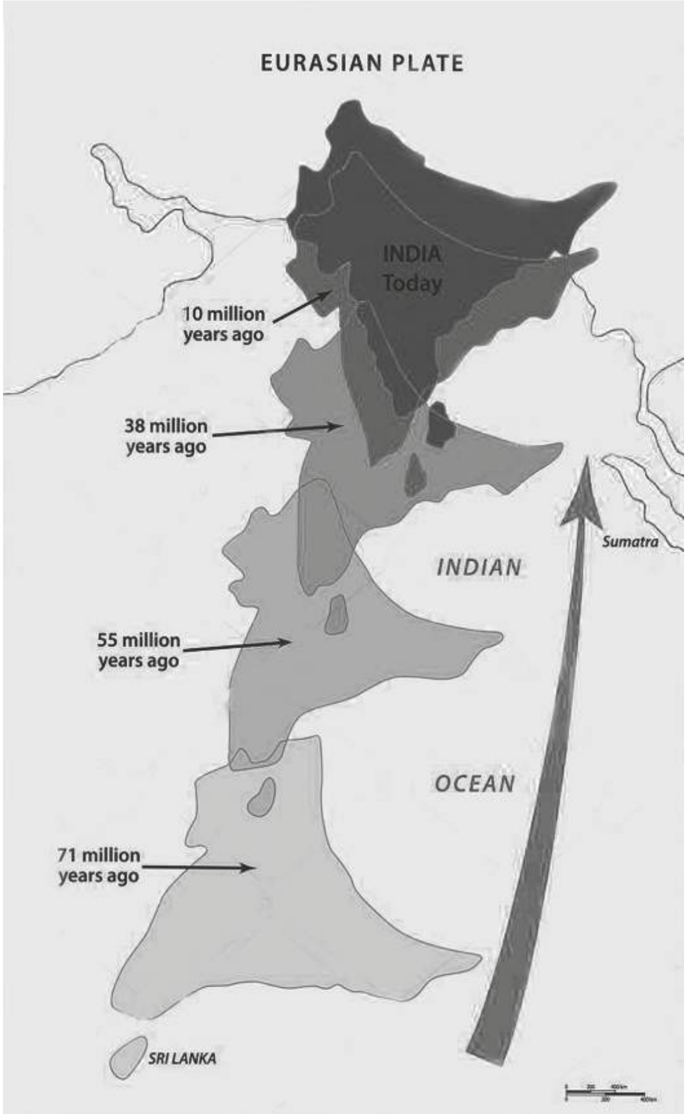

কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে ফেললাম। খোসাটি মোট আট-দশ টুকরো হয়ে গেল। খোসাটিকে আবার লেবুর গায়ে মাপমতো বসিয়ে দিলাম। এবার লেবুকে যেমন দেখাবে ঠিক তেমনি এই পৃথিবী হয়ে রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর উপরের ওই টুকরোগুলি চলমান। টুকরোগুলোকে বলা হয় পাত বা Plate। ভূগর্ভে তরল ম্যাগমার পরিচলন স্রোত, অভিকর্ষজ টান এবং আরো কিছু কারণে পাতগুলি গতিশীল হয়। পাত আবার দুই প্রকারের—মহাদেশীয় এবং মহাসাগরীয় পাত। এক্ষেত্রে মহাদেশীয় পাত হাল্কা এবং মহাসাগরীয় পাত ভারি। যাইহোক পাতের সরে যাওয়া তিন প্রকারের হতে পারে।

১) দুটি পাত পরস্পরের বিপরীতে সরে গেলে তাকে প্রতিসারী বা অপসারী চলন (Divergent Movement) বলে।

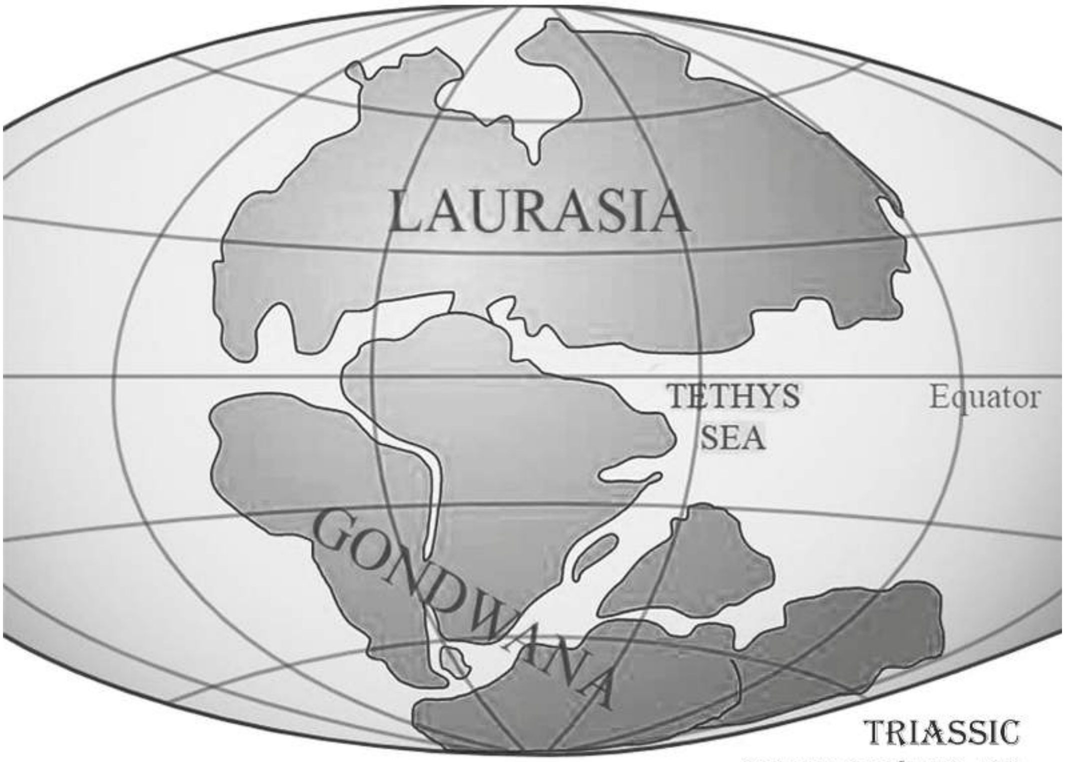

উভয় পাতের মাঝে সেই সময়ে যে প্রাচীন জলভাগ অবস্থান করছিল তাকে আমরা টেথিস সাগর নামেই চিনি। পাত দুটির সংঘর্ষে টেথিস সাগরের বুকে জমে থাকা পলিরাশি ইউরেশীয় পাতের বুকে সঞ্চিত ও সংকুচিত হতে লাগল। ভারতীয় পাতের প্রবল চাপে ইউরেশীয় পাত সংকুচিত ও পুরু হয়ে পড়ল। এভাবেই গড়ে উঠল হিমালয়, কারাকোরাম প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বতমালা এবং তিব্বতের মালভূমি। উল্লেখ্য এই কারণেই অঞ্চলটিতে পাতের গভীরতা বর্তমানে প্রায় ৭৫ কিমি, যা স্বাভাবিকের তুলনায় দ্বিগুণ।

২) দুটি পাত পরস্পরের দিকে সরে এলে তাকে অভিসারী চলন (Convergent Movement) বলা হয়।

৩) দুটি পাত পাশাপাশি সরে গেলে তাকে নিরপেক্ষ চলন (Trans-current Movement) বলা হয়।

এক্ষেত্রে যেহেতু পাত দুই প্রকারের (মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয়), তাই তিন প্রকার চলনের মধ্যেই পাতের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের কারণে অনেকরকম জটিলতা দেখা যায়। আমাদের আলোচনা বিষয়ে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করলে অভিসারী চলন এবং দুটি মহাদেশীয় পাতের কথা ভাবতে হয়। অর্থাৎ দুটি মহাদেশীয় পাত যদি পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হতে পারে?

প্রসঙ্গক্রমে বলি মহাদেশীয় পাত হাল্কা। তাই দুটিই পরস্পরমুখী হাল্কা পাত হওয়ায় কেউ সহজে অপরের নীচে যেতে চায় না। ফলতঃ তীব্র সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। সীমানা বরাবর পাতদুটি দুমড়ে মুচড়ে ভঙ্গিল পর্বত গঠন করে।

এবার আমরা ফিরে আসি হিমালয়ের উৎপত্তি বিষয়ে। আগেই বলেছি যে ২২৫০ লক্ষ বছর আগে দক্ষিণ গোলার্ধের সমুদ্রে দ্বীপ অবস্থানে ছিল ভারত ভূখন্ড। এখন থেকে ৮০০ লক্ষ বছর আগে সে বর্তমান অবস্থান থেকে প্রায় ৬৪০০ কিমি দক্ষিণে অবস্থান করছিল এবং প্রতি বছর ৯-১৬ সেমি হারে সরে আসছিল উত্তরদিকে। অবশেষে প্রায় ৫০০ লক্ষ বছর আগে ইউরোপীয় স্থলভাগের সাথে ভারত ভূখন্ডের সংঘর্ষ শুরু হল এবং এর ফলে বাৎসরিক সরণের হার কমে দাঁড়াল ৪-৫ সেমি। অর্থাৎ দুটি মহাদেশীয় পাত যথা ইউরেশীয় পাত এবং ভারত উপদ্বীপীয় পাত পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হল।

সাম্প্রতিক ভূগোলের নিরিখে ভারতের উত্তরে অর্ধচন্দ্রাকারে পশ্চিমে নাঙ্গা পর্বত থেকে পূর্বে অরুণাচল প্রদেশের নামচাবারওয়া শৃঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালা প্রায় ২৪০০ কিমি দীর্ঘ এবং ২০০-৫০০ কিমি প্রশস্ত। এই বিরাট ভূখন্ডকে উত্তর থেকে দক্ষিণে আমরা চারটি সমান্তরাল অঞ্চলে ভাগ করে থাকি।

১) টেথিস হিমালয় ঃ হিমালয়ের সবথেকে প্রাচীন অংশ। মূলত তিব্বতের অন্তর্গত। তবে অংশবিশেষ লাদাখ—হিমাচল প্রদেশে দেখা যায়।

২) হিমাদ্রি হিমালয় ঃ হিমালয়ের উচ্চতম অংশ। মাউন্ট এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি প্রধান শৃঙ্গগুলি এই অংশেই অবস্থান করছে। টেথিস হিমালয়ের সাথে সাথেই হিমাদ্রির সৃষ্টি হয়েছিল।

৩) হিমাচল হিমালয় ঃ ২৫০-৩০০ লক্ষ বছর পূর্বে দ্বিতীয়বার উল্লেখযোগ্য ভূ-আলোড়নের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়। আমরা হিমালয়ে যে সব জায়গায় বেড়াতে যাই (মুসৌরী, সিমলা প্রভৃতি) সেগুলি এই অংশেই রয়েছে।

৪) শিবালিক বা অব-হিমালয় ঃ মূল হিমালয় সৃষ্টির অনেক পরে বিভিন্ন ক্ষয়জাত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে পুনরায় ভূ-আলোড়নে মাত্র ২০-২০০ লক্ষ বছর আগে এর উৎপত্তি হয়েছে। এবং সত্যি কথা বলতে কী আদিম মানুষ হয়ত শিবালিকের উৎপত্তি দেখেছে।

এখানে কয়েকটা বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা না করলে মনে কিছু খটকা থেকে যেতে পারে। তাই সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করে এই নিবন্ধ শেষ করব।

১) দুটো এত বড় বড় পাত যুক্ত হল, তাদের সংযুক্তির কোনো চিহ্ন নেই? অবশ্যই আছে। আমাদের ত্বকের কাটা অংশ জুড়ে গেলে

যেমন দাগ থাকে, তেমনই আছে। একে ভূগোলের ভাষায় বলে 'Suture Line' বা 'সেলাই রেখা'। একদিকে সিন্ধু আর একদিকে সাংপো অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদী এই জোড় বরাবর বয়ে যাচ্ছে। এই অংশে

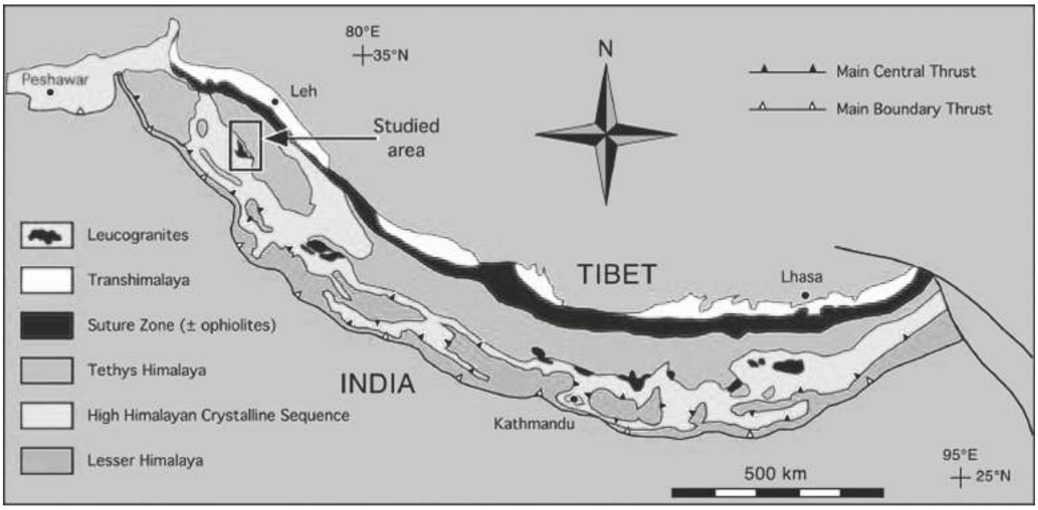

বিভিন্ন চিহ্ন দুটি পাতের জোড়কে প্রমাণ করে। যেমন, ওফায়োলাইট জাতীয় শিলার উপস্থিতি। এই প্রকার শিলা সামুদ্রিক উৎস থেকেই আসে। তাই এখানে তার অবস্থান অতীতে দুটি পাতের মাঝে টেথিস সাগরের থাকার কথা মনে করায়।

২) এত বড় বড় পাতের সংঘর্ষ হল তাও এখানে কোনো আগ্নেয়গিরি নেই কেন? এই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। রকি, আন্দিজ প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বতে কিন্তু অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। আসলে মনে রাখতে হবে হিমালয়ের ক্ষেত্রে দুটো পাতই মহাদেশীয়। তাই কেউই গভীরে চলে যায়নি। ফলে ভূগর্ভে পাত গলে ম্যাগমা সৃষ্টি হয়নি। তবুও তিব্বতীয় মালভূমি অংশে ভূগর্ভ থেকে ম্যাগমা শিলাস্তরের মধ্যে দিয়ে খানিক দূর অবধি উঠেছে। তবে সেখানে পাত এত গভীর যে ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠের উপরে উঠতে পারেনি। শিলাস্তরের মধ্যেই তা সঞ্চিত হয়ে অনেক ব্যাথোলিথ (ভূগর্ভে সঞ্চিত বিশালাকার আগ্নেয় শিলাস্তূপ) সৃষ্টি হয়েছে।

৩) হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে এত ভূমিকম্প হয় কেন?

হিমালয়ের মতো নবীন ভঙ্গিল পর্বতে এটাই স্বাভাবিক। দুটি পাতের চলন এখনো বজায় রয়েছে। ফলে হিমালয়ের গঠনকাজ এখনো চলছে। বলা হয় যে প্রতি বছরে গড়ে হিমালয়ের উচ্চতা ১ সেমি করে বাড়ছে। এই কারণেই হিমালয় পার্বত্যভূমি ভূমিকম্পপ্রবণ। তাহলে এভারেস্ট কী এভাবেই তরতর করে আরও লম্বা হয়ে যাবে? না, সে গুড়ে বালি। কারণ প্রতি বছর নদী-হিমবাহ-বাতাস-আবহবিকার প্রভৃতির দ্বারা প্রায় একই হারে হিমালয়ের ক্ষয়কাজও চলছে।

৪) হিমালয়ের উৎপত্তি বিষয়ে এতক্ষণ যত কথা বললাম তা পড়ে মানুষের মনে কোথাও অবিশ্বাস দানা বাঁধতেই পারে। যেখানে রয়েছে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা সেই স্থান এক সময় সমুদ্রগর্ভে ছিল—একথা মেনে নিতে কষ্ট তো হয়ই। তাই সে বিষয়ে দু-একটি অকাট্য প্রমাণ দেওয়া আবশ্যিক।

হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট। এই শৃঙ্গের নিচের দিকে আছে গ্রিনসিস্ট শিলা। তার উপর হলদেটে মার্বেল এবং সবার উপরে চুনাপাথর। এই চুনাপাথরের স্তরে জীবাশ্মের উপস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয়। ১৯২৪ সালে এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের সদস্য 'Crinoids' -এর জীবাশ্ম পেয়েছেন। উল্লেখ্য 'Crinoids' হল সমুদ্রলিলি জাতীয় জলজ প্রাণী। এছাড়াও ওই শিলাস্তর থেকে trilobites, brachiopods, ostracods প্রভৃতির জীবাশ্ম পাওয়া গেছে যেগুলি সবই সমুদ্রজলের প্রাণী। এখানে আরো একটা মজার বিষয় না উল্লেখ করে থাকা যাচ্ছে না। আমরা জানি, হিমালয়ের উৎপত্তি হয়েছে কমবেশি শেষ ৫০০ লক্ষ বছরে। টেথিস সাগরের বয়স প্রায় ২০০০ লক্ষ বছর। অথচ

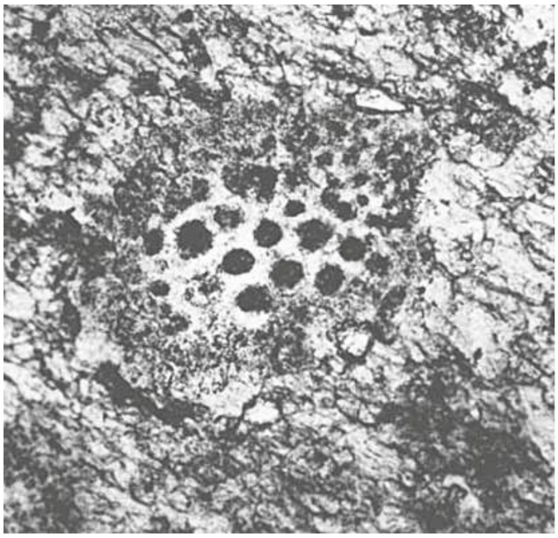

মাউন্ট এভারেস্টে প্রাপ্ত জীবাশ্ম

এইসব জীবাশ্মের বয়স ৫২০০-৪৫০০ লক্ষ বছর। অর্থাৎ এভারেস্টের চূড়ায় যে পাথর রয়েছে তার বয়স, হিমালয় তো বটেই বরং টেথিস সাগরের চেয়েও অনেক বেশি। কেমন হযবরল ব্যাপার! ধরি আমার বয়স ৪৩, আর আমার মাথার বয়স ১২০! হ্যাঁ, এটাই সত্যি। হিমালয় সৃষ্টির অনেক আগে এইসব পাথর সমুদ্রগর্ভে পলি জমে গড়ে উঠেছে। পরে তা ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়ায় স্থান পেয়েছে হিমালয় পর্বতে।

সবশেষে এটুকুই বলি, হিমালয় শুধুমাত্র ভারতের মানচিত্রে উত্তরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ভৌগোলিক বিষয়মাত্র নয়। ভারত ভূখন্ডের কাছে হিমালয় পর্বত এক অবশ্যম্ভাবী প্রভাব যা বাকি এশিয়া থেকে আড়াল করে রেখে এই ভারতীয় সংস্কৃতি ও জনজীবনে বিশেষ মৌলিকতা এনে দিয়েছে। হিমালয়ের ফাঁকফোকর গলে পার্বত্যপথে আর্য কিংবা তার পরবর্তী কালের মানুষেরা ভারতে প্রবেশ করেছে এবং ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির উপর দৃঢ় ছাপ ফেলেছে।

email:rajdipb1976@gmail.com • M. 9836569850

অ জ য় না থ

হিমালয়ের জলবায়ু

হিমালয়ের জলবায়ু নিয়ে কোনরকম আলোচনায় যাবার আগে আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি যে হিমালয় আসলে কি। হিমালয় শব্দের অভিধানিক অর্থ হিম বা বরফের আলয়। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে বহু কোটি বছর আগে ভারতীয় প্লেট ও ইউরেশিয়ান প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তৈরি হওয়া পশ্চিমে পাকিস্তান থেকে পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত প্রায় ২৩০০ কিলোমিটার বিস্তৃত অতি উচ্চ পর্বতশ্রেণি যার গড় উচ্চতা ৬১০০ মিটার। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গের অনেকগুলি হিমালয় পর্বতশ্রেণির অন্তর্গত। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ক্রম অনুসারে রয়েছে নাঙ্গা পর্বত, অন্নপূর্ণা, মাউন্ট এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা।

হিমালয়ের অনেকগুলি ভাগ রয়েছে। কারাকোরাম পর্বতশ্রেণি থেকে শুরু করে হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গসমূহ রয়েছে হিমালয়ের উত্তর ভাগে। হিমালয়ের উত্তরভাগকে বলা হয় উচ্চ হিমালয়। পশ্চিমে পাকিস্তান, ভারতের কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, নেপাল, সিকিম, দার্জিলিং, ভুটান, তিব্বত মালভূমি সংলগ্ন চিন এবং অরুণাচল প্রদেশের উত্তর অংশ উচ্চ হিমালয়ের অন্তর্গত। উত্তর হিমালয় থেকে আমরা যত দক্ষিণে সরে আসব ততই তার উচ্চতা কমতে থাকে। পাকিস্তান ও ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর ভাগ হিমালয় সংলগ্ন সমতলভূমি। এর অধিকাংশ অঞ্চল হিমালয়ের বিভিন্ন হিমবাহ থেকে উৎপন্ন সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা বিধৌত উর্বর সমতলভূমি। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থল চিনের অন্তর্গত তাই ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

ভারতে বছরভর যে বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি তার মূলে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা। বর্ষায় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মধ্য ও উত্তর ভারতের পশ্চিম থেকে উত্তর পূর্ব প্রান্ত এমনকি বাংলাদেশে যে বৃষ্টিপাত হয় তার মূলে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা। শীতের অতি শীতলতার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে হিমালয় পর্বতমালা। গ্রীষ্মের দাবদাহও হিমালয় পর্বতমালার অবদান। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হিমালয়ের জলবায়ু তাই এই সম্পর্কে বিষদে বলা থেকে বিরত থাকলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিজেরাই খোঁজখবর নেবেন বলে আমি মনে করি।

হিমালয়ের জলবায়ু সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, নেপাল, সিকিম, দার্জিলিং, তিব্বত, ভুটান এবং অরুণাচল প্রদেশের জলবায়ু সম্পর্কে জানতে হবে। গোটা হিমালয় পর্বতমালা উপক্রান্তিয় বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত। হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গগুলির উচ্চতা আট হাজার মিটারের বেশি তাই সেগুলি যে বরফাচ্ছাদিত থাকবে সেটা স্বাভাবিক। উপক্রান্তিয় অঞ্চলে গড়ে চার কিলোমিটারের বেশি উচ্চতা হলেই বাতাসের তাপমাত্রা থাকে শূন্য ডিগ্রির নিচে। বাতাসের গতিবেগ থাকে অত্যন্ত বেশি। ছয় কিলোমিটার উচ্চতায় বাতাসের তাপমাত্রা থাকে গ্রীষ্মে শূন্যের চেয়ে ৮ ডিগ্রি কম বা মাইনাস ৮ ডিগ্রি এবং শীতে তা কমে হয় মাইনাস ২৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

পৃথিবীতে জলবায়ুর বিভাজনে ভ্লাদিমির কোপেনের মত সবচেয়ে বেশি মান্যতা পায়। কোপেন জলবায়ু বিভাজন করেছেন তিনটি প্রধান আবহাওয়া চালকের পরিপ্রেক্ষিতে। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা অনুসারে। চতুর্থ আরও একটি চালকের কথা বলেছেন সেটি হল উদ্ভিদ বা vegetation। এই চারটি চালক অনুসারে হিমালয়ের জলবায়ু বৈচিত্র্য এতটাই বেশি যে ভিন্ন ভিন্ন পর্বতশ্রেণিতে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু পরিলক্ষিত হয় এমন কি একই পর্বতশ্রেণির ভিন্ন ঢালেও জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় উত্তরাখণ্ডের মুসৌরী পর্বতশ্রেণির শহর দেরাদুন এবং হিমাচলপ্রদেশের সিমলা শহর দুটি একে অপরের দিকে মুখ করে রয়েছে এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র ১৪৫ কিলোমিটার। কিন্তু দেরাদুনে গোটা বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যেখানে ২৩৩৫ মিলিমিটার সেখানে সিমলা শহরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫৭৫ মিলিমিটার। হিমালয়ে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জন্য এবং বর্ষায় মৌসুমি বায়ু প্রবাহের জন্য।

এই নিবন্ধে তিব্বতের জলবায়ুর সম্পর্কে আলাদা ভাবে কিছু বলা নেই। তিব্বত আদতে মালভূমি যার গড় উচ্চতা ৪০০০ মিটার। ভারতীয় উপমহাদেশে তিব্বতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভুটানের উপর একটি উচ্চচাপ বলয় থাকে যা মৌসুমি বাতাসকে ভারতের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেয়। বর্ষার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ভুটানের উপর স্থিত উচ্চচাপ বলয়ের শক্তির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

কাশ্মীর উপত্যকা

কাশ্মীর উপত্যকা আকারে খুব বড় নয়। ১৫,৫২০ বর্গ কিলোমিটার। উপত্যকাকে ঘিরে রয়েছে উত্তরে তিব্বতের মালভূমি, পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে রয়েছে পিরপাঞ্জাল গিরিশ্রেণি যা উপত্যকাকে পাঞ্জাবের সমভূমি থেকে আলাদা করেছে। উত্তর পূর্বদিকের হিমালয়ের মূল পর্বতমালা থেকে ধীরে ধীরে উপত্যকা নেমে এসেছে যার গড় উচ্চতা ১৮৫০ মিটার। কাশ্মীর উপত্যকার জলবায়ু মূলত উপক্রান্তিয় অঞ্চলের জলবায়ুর সমতুল। এখানে গ্রীষ্মকালে হাল্কা গরম থাকে। কখনও কখনও তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি হয়ে যায় বিশেষ করে শ্রীনগরে। জুলাই মাসে উপত্যকায় সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে। আর্দ্রতার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলেও রাতের দিকে ঠান্ডা থাকে। উপত্যকার জুলাই মাসের

অমরনাথের পথে পঞ্চতরণী ছবি : সুব্রত অধিকারী

শীতকাল স্থায়ী হয় মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত। তবে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় হিমাচল প্রদেশের আবহাওয়া সুখকর থাকে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে জুন মাসের শেষ থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। প্রকৃতি নতুন সাজে সেজে ওঠে। ঝর্ণা ও পাহাড়ি ছোট নদীসমূহ জল ভরে থাকে। জুলাই ও আগস্ট মাসে বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস এবং বন্যা হয়। হিমাচল প্রদেশের জেলাগুলির মধ্যে ধরমশালাতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। উচ্চতা হিসাবে হিমাচল প্রদেশের বিভাজন ৮০০ মিটার পর্যন্ত উপত্যকা ও পাহাড়ের সানুদেশ। ৮০০ থেকে ১৬০০ মিটার পাহাড়ি অঞ্চল। ১৬০০ থেকে ২৭০০ মিটার পার্বত্য অঞ্চল। ২৭০০ থেকে ৩৬০০ মিটার পর্যন্ত আলাপাইন অঞ্চল যার

গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। শরৎকাল থেকে অর্থাৎ অক্টোবর মাস থেকে শীত শুরু হয় এবং চলে মার্চ মাস পর্যন্ত। এই সময় পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে তুষারপাত হয়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসেই সাধারণত সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা পড়ে। জানুয়ারি মাসের গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ০ ডিগ্রি ও -১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অনেক সময় শ্রীনগরের তাপমাত্রা শূন্যের নিচে নেমে যায়। ডাললেকের জল জমে বরফ হয়ে যায়। উপত্যকার উচ্চভূমি গুলমার্গে তুষারপাতের ফলে বরফ জমে থাকে। ঐ অঞ্চলের জলবায়ু আলপাইন জলবায়ুর মত। হিমালয়ের যে অঞ্চলে গাছপালা জন্মায় না ঠান্ডার জন্য এবং বছরের কোন সময় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি হয় না সেই অঞ্চলের জলবায়ুকে আলপাইন বা উঁচু পার্বত্য জলবায়ু বলা হয়। ২০১২ সালের ৫ জুলাই ও ৬ জানুয়ারিতে তাপমাত্রা ছিল ৩৩ ডিগ্রি ও -১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম কারণ কাশ্মীর উপত্যকায় মৌসুমি বায়ুর প্রভাব থাকে খুবই সামান্য। তবে এই সামান্য প্রভাব কখনও কখনও ভয়ঙ্কর হতে পারে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখ থেকে লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে ৫ তারিখ ঝিলম নদীর বন্যায় শ্রীনগর শহর বন্যা কবলিত হয়েছিল। এই প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণ ছিল উপক্রান্তিয় ঘূর্ণিঝড় ও মৌসুমি বায়ুর সংঘাত।

হিমাচলপ্রদেশ

হিমাচল প্রদেশের জলবায়ু বৈচিত্র্য অনেক বেশি। হিমাচল প্রদেশের উচ্চতা সর্বনিম্ন ৪৫০ মিটার থেকে ৬৫০০ মিটার। দক্ষিণের নিম্ন অঞ্চলের (৪৫০ থেকে ৯০০ মিটার) জলবায়ু ক্রান্তিয় উষ্ণ ও আর্দ্র। ৯০০ থেকে ১৮০০ মিটার উচ্চতায় জলবায়ু একই সঙ্গে উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ, ১৯০০ থেকে ২৪০০ মিটার উচ্চতায় নাতিশীতোষ্ণ ও শীতল এবং ২৪০০ থেকে ৪৮০০ মিটার উচ্চতায় শীতল হিমবাহ আর আলপাইন জলবায়ু অঞ্চল। অক্টোবর মাস থেকে রাতের দিকে ও সকালে খুব ঠান্ডা থাকে। ৩০০০ মিটার উচ্চতা থেকেই তুষারপাত শুরু হয়। ৪৫০০ মিটার উচ্চতা থেকে শুরু হয় জমে থাকা বরফের সাম্রাজ্য।

পাহাড়ের কোলে নাকো ছবি : তাপস মজুমদার

মধ্যে রয়েছে লাহুল, স্পিতি ও কিন্নর। উচ্চতা অনুসারে জলবায়ু উপক্রান্তিয়, সামান্য উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ, আর্দ্র শীতল এবং নাতিশীতোষ্ণ। সবচেয়ে উঁচু পার্বত্যভূমির জলবায়ু শুষ্ক এবং অতি শীতল। স্পিতি হিমাচল প্রদেশের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। বছরে ৫০ মিলিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হয়। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হিমাচল প্রদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংখ্যা বেড়েছে। জুলাই ২০২১-এর ধরমশালা বিপর্যয় ছিল গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

উত্তরাখণ্ড

উত্তরাখণ্ড এখন আলাদা রাজ্য হলেও আগে উত্তরপ্রদেশের অংশ ছিল। ভারত মৌসম বিজ্ঞান বিভাগের উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ি এলাকা নামের একটি উপবিভাগ ছিল। এখন সেটাকে উত্তরাখণ্ড উপবিভাগ করা হয়েছে। উত্তরে তিব্বতের মালভূমি, পশ্চিমে হিমাচলপ্রদেশ, দক্ষিণে উত্তরপ্রদেশের সমভূমি এবং পূর্বে নেপালের সুদূর পশ্চিম প্রান্ত রয়েছে। হিমালয়ের মধ্য ও নিম্ন ভাগের বেশ কিছুটা অংশ নিয়ে উত্তরাখণ্ড। এর দুটি ভাগ। গাড়োয়াল হিমালয় ও কুমায়ুন হিমালয়।

উত্তরাখণ্ডের জলবায়ু দুটি ভাগে বিভাজিত। উচ্চ হিমালয়ের পাহাড়ি জলবায়ু এবং নিম্ন অঞ্চলের সমতলের জলবায়ু। উত্তরাখণ্ডে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং মৌসুমি বায়ু দুয়েরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

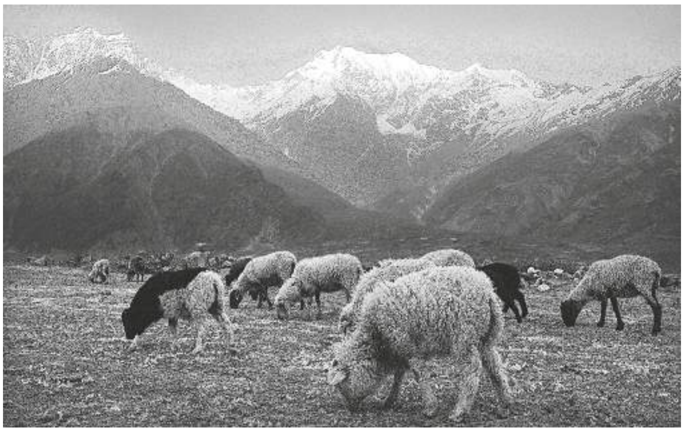

পঞ্চচুল্লীর উপত্যকা ছবি : তাপস মজুমদার

বর্ষাকালে জুন ও জুলাই মাসে মৌসুমি বাতাস ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সংঘাতের ফলে প্রবল আকারের বজ্রমেঘের সৃষ্টি হয়। মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি আকছার হয়ে থাকে। ২০১৩ সালের জুন মাসে কেদারের বিপর্যয় তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ২০২১ সালের জুলাই মাসের ২০ তারিখ উত্তর কাশীতেও মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টির ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেক জীবনহানীও হয়েছে। বর্ষায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। তৎসত্ত্বেও উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি অঞ্চলে গ্রীষ্মের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং আরামপ্রদ। নিম্ন অঞ্চলের জলবায়ু অনেকটা গাঙ্গেয় সমভূমির মত চরম ভাবাপন্ন। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা কোথাও কোথাও ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় আবার শীতে ৫ ডিগ্রি বা তার নীচে নেমে যায়। দক্ষিণের পাহাড়ের পাদদেশে জলবায়ু উপক্রান্তিয় অঞ্চলের মত। গ্রীষ্মের গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ১৮ ডিগ্রি। মধ্যভাগের পার্বত্য উপত্যকা অঞ্চলের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা থাকে ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। শীতে তাপমাত্রা থাকে শূন্য ডিগ্রি বা তার চেয়ে কম। উচ্চ পাহাড়ি অঞ্চলের জলবায়ু শীতল। তাপমাত্রা থাকে ১৫/১৮ থেকে শূন্য ডিগ্রির নীচে।

লাদাখ

লাদাখের জলবায়ু সম্পর্কে আলাদা ভাবে বলতে হয় কারণ উত্তরের চিন সংলগ্ন অঞ্চলের জলবায়ু শীতল মরুভূমির মত। সারা বছর বরফ জমাট বাঁধা অবস্থায় থাকে। শীতে তুষারপাতের ফলে তা আরও গভীর হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। জুলাই-আগস্ট মাসে দক্ষিণ ভাগে খুব অল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। এখানে গ্রীষ্মকালের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ।

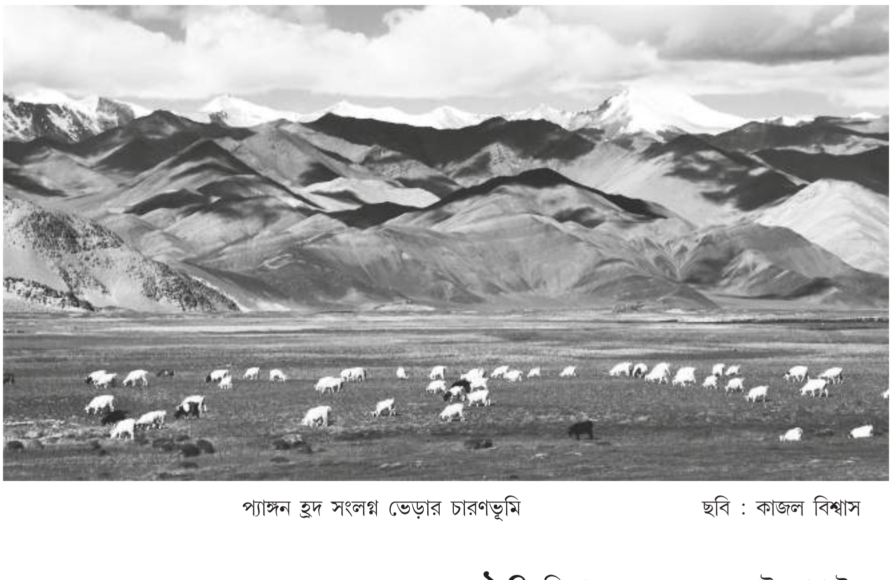

প্যাঙ্গন হ্রদ সংলগ্ন ভেড়ার চারণভূমি ছবি : কাজল বিশ্বাস

নেপাল হিমালয়

নেপাল হিমালয়ের ঋতু পাঁচটি। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এবং শীত। উত্তর নেপালের জলবায়ু গ্রীষ্মে নাতিশীতোষ্ণ এবং শীতে প্রচন্ড ঠান্ডা।

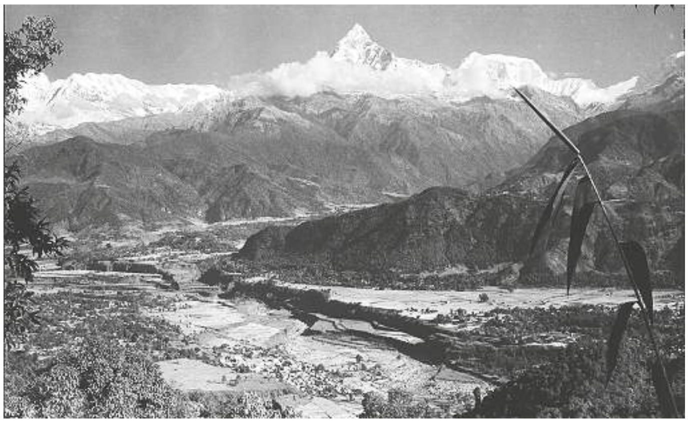

পোখরা, পিছনে মচ্ছপুচ্ছম শিখর ছবি : তাপস মজুমদার

দক্ষিণের তরাই অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। কোথাও তা ৪৫ ডিগ্রির বেশি হয়ে থাকে। শীতকালে তাপমাত্রা নেমে যায় ২৩ থেকে ৭ ডিগ্রি পর্যন্ত। নেপালের কাঠমান্ডু উপত্যকার জলবায়ু অত্যন্ত মনোরম। তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি ২০ থেকে ৩৫ ডিগ্রি এবং সবচেয়ে কম থাকে ২ ডিগ্রি থেকে ১২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। নেপাল হিমালয়ে প্রতি এক কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি করে কমে যায়।

নেপাল হিমালয়ের উত্তরের ঢালগুলি সাধারণত বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। নেপাল হিমালয়ে বছরের গড় বৃষ্টিপাতের ৮০ শতাংশ হয় দক্ষিণ ঢালে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে অর্থাৎ বর্ষাকালে। নেপাল হিমালয়ের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৬০০ মিলিমিটার। তবে সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাতের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। পোখরায় বছরে ৩৩৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হলেও মুস্তাং-এ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৩০০ মিলিমিটার। হিমালয়ের উঁচু শৃঙ্গগুলির মধ্যে ধৌলাগিরি, অন্নপূর্ণা মাকালু, মানশূল এবং এভারেস্ট নেপালেই অবস্থিত। নেপাল হিমালয়ে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে তুষারঝড়ের প্রবণতাও রয়েছে। ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে অন্নপূর্ণা সার্কিটের তুষারঝড় উল্লেখযোগ্য। যারা নেপালে পর্বতারোহণে যান তাদের অনেক সময় তুষারঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া তুষারধ্বসও নেপালের অনেক হিমবাহের মধ্যে হয়ে থাকে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহের নীচের অংশ গলে যাচ্ছে ফলে তুষারধ্বস সংখ্যায় বাড়ছে।

ভুটান

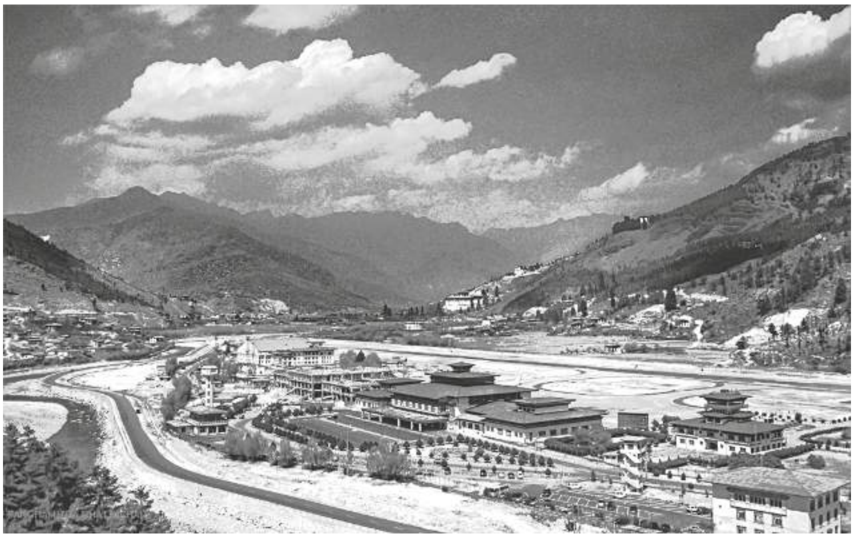

পাহাড়ের কোলে থিম্পুর বসতি ছবি : সংঘমিত্রা ভট্টাচার্য

হিমালয়ের ভুটান অংশের জলবায়ু পৃথিবীর যে কোন সমপরিমাণ অংশের চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। এখানে উচ্চতার সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন হতে থাকে। সূর্যালোক এবং আর্দ্র বাতাসের তারতম্যের জন্য স্বল্পদূরত্বের ব্যবধানে স্থানীয়ভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন হয় ভুটান হিমালয়ে। উষ্ণ, আর্দ্র এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু দেখা যায় ডুয়ার্সের সমভূমিতে ও সংলগ্ন হিমালয়ের পাদদেশে। নিম্ন হিমালয়ের শীতল এবং উচ্চ হিমালয়ের তুন্দ্রা ও আলপাইন জলবায়ু রয়েছে ভুটানের নাতিবৃহৎ হিমালয় অংশে। মধ্যভাগের পাহাড়ি উপত্যকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। রাজধানী থিম্পুর জানুয়ারি মাসের তাপমাত্রা থাকে রাতের ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে দিনের ১২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে। জুলাই মাসে তাপমাত্রা থাকে ১৯ থেকে ১৩ ডিগ্রির মধ্যে। তাছাড়া ভুটান হিমালয়ের জলবায়ু ডুয়ার্সের চূড়ান্ত উষ্ণ অবস্থা থেকে উত্তরের চরম শীতল।

অরুণাচল প্রদেশ

হিমালয়ের অরুণাচল প্রদেশ অংশে উচ্চতার সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে হিমালয়ের অন্যান্য অংশের মত। এখানে হিমালয়ের কম উচ্চ অংশের জলবায়ু উপক্রান্তিয় আর্দ্র। অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল উষ্ণ এবং আর্দ্র। শীতকালে ঠান্ডা তেমন জোরাল নয়। উচ্চ অংশের জলবায়ু উপক্রান্তিয় উচ্চভূমির ও আলপাইনের সমতুল। বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০০ থেকে ৫০০০ মিলিমিটার। ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয় মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে।

তাওয়াং সংলগ্ন জঙ্গ জলপ্রপাত ছবি : তাপস মজুমদার

দার্জিলিং হিমালয়

হিমালয়ের দার্জিলিং অংশটি খুবই ছোট। এপ্রিল এবং মে মাসে দার্জিলিং হিমালয়ের জলবায়ু থাকে আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে দার্জিলিং হিমালয়ে মৌসুমি বাতাসের সরাসরি প্রভাব পড়ে। তাই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। দার্জিলিং হিমালয়ের নিম্নভাগে উপক্রান্তিয় আর্দ্র জলবায়ুর সাথে ক্রান্তিয় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু দেখা যায়। অক্টোবর মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত দার্জিলিং হিমালয়ের উচ্চ অংশের জলবায়ু উপক্রান্তিয় শুষ্ক ও শীতল জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। নিম্ন অংশের জলবায়ু থাকে নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র ও শুষ্ক।

সান্দাকফু, পায়ের নিচে মেঘরাশি ছবি : সুব্রত অধিকারী

উপসংহার

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে হিমালয়ের বিভিন্ন অংশের জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। মৌসুমি বাতাস ও পশ্চিমি ঝঞ্ঝার সংঘাতের ফলে মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টিপাতের সংখ্যা বাড়ছে গোটা হিমালয় জুড়ে। সেই সঙ্গে বেড়েছে হড়পা বান এবং ভূস্খলনের সংখ্যাও। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে জলীয়বাষ্পের যোগান বৃদ্ধির ফলে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেড়েছে গত দুই দশক ধরে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা বেড়েছে চোখে পড়ার মত। উচ্চ হিমালয় ছাড়া অন্যত্র ঠান্ডার পরিমাণ কমছে দ্রুততার সাথে। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পর্যটনকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে হিমালয়ের বিভিন্ন অংশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যাপক হারে। তাই তিন চার দশক আগের হিমালয়ের যে জলবায়ু পরিলক্ষিত হত তার পরিবর্তন ঘটেছে। এই নিবন্ধে হিমালয়ের গড় জলবায়ু চিত্র দেওয়া হয়েছে। এখন যারা হিমালয়ে যাবেন তাদের সামনে বছরের যে কোন সময়েই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। তাই হিমালয়ে যাওয়ার সময় তেমন মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই যেতে হবে।

email:nathajoy85@gmail.com • M. 9433802339

ড. রা জা রা উ ত

হিমালয়ের বিপন্ন বন্যপ্রাণীরা

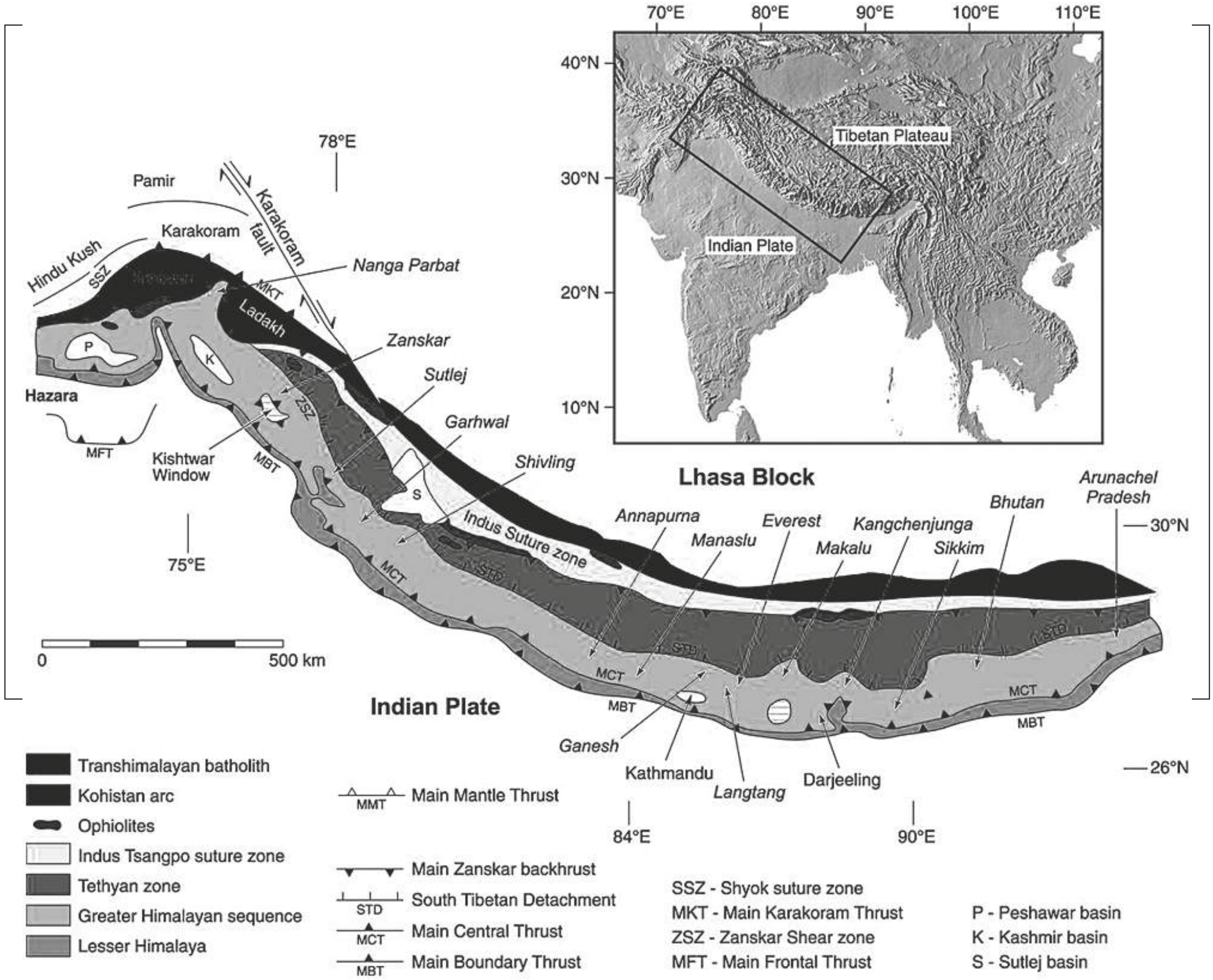

হিমালয় পর্বতশৃঙ্খলা সারা পৃথিবীর নবীনতমদের মধ্যে অন্যতম যার সর্বোচ্চ শৃঙ্গই আবার পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই পর্বতমালাকে অনেকে আবার 'Water Tower' রূপে চিহ্নিত করেছেন। পৃথিবীর বেশ কয়েকটি বড় নদ-নদীর উৎসস্থল হল এই হিমালয় পর্বতমালা। পশ্চিমে নাঙ্গা পর্বত থেকে শুরু করে পূর্বে নামচিবারওয়া পর্বত প্রায় ২৫০০ কিমি. পর্যন্ত বিস্তৃত যার বেধ প্রায় ২০০-৫০০ কিমি. জুড়ে রয়েছে জায়গায় জায়গায়।

বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ হিমালয় অঞ্চলকে প্রধানত দুটি 'জৈব ভৌগোলিক (Biogeographic) অঞ্চল (Zone)' রূপে চিহ্নিত করেছেন। **জোন-১** অঞ্চলকে 'ট্রান্স হিমালয়' এবং **জোন-২** 'গ্রেটার হিমালয়' রূপে উল্লেখ করেছেন (Rodgers et al., 2000)। 'ট্রান্স হিমালয়'—1A ও 1B রূপে এবং 'গ্রেটার হিমালয়'—2A, 2B, 2C ও 2D রূপে চিহ্নিত। হিমালয়ের বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া ও জলবায়ু হিমালয় অঞ্চলকে পৃথিবীর একটি অন্যতম জৈব বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ অঞ্চল রূপে জীবজগতে উপহার দিয়েছে।

হিমালয় অঞ্চল জুড়ে আনুমানিক ১০,০০০ প্রজাতির অধিক উদ্ভিদের বসবাস। জীব বিজ্ঞানীদের মতে এই পুরো অঞ্চল জুড়ে প্রায় **৭১** গণের অধীনে প্রায় **৩১৬০**টি প্রজাতি কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ যাদের এন্ডেমিক বা আঞ্চলিক সীমাবদ্ধ প্রজাতি রূপে চিহ্নিত করা গেছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ইতিমধ্যে জানা গেছে যে হিমালয় সম্পূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে পাঁচটি উদ্ভিদগোত্র বা ফ্যামিলি—টেট্রাসেন্ট্রাসি (Tetracentraceae), হামামেলিডেসি (Hamameli-daceae), সার্কঅ্যাস্টেরেসি (Circaesteraceae), বুটোমেসি (Butomaceae) এবং স্ট্যাক্যুইরেসি (Stachyuraceae) কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। হিমালয়ের পূর্ব অংশে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য আরও সমৃদ্ধ।

হিমালয়ের ভৌগোলিক গঠন বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীবৈচিত্র্যকে আশ্রয় দিয়েছে। একদম হিমালয়ের পাদদেশের ক্রান্তীয় পর্ণমোচী প্রকৃতির বনাঞ্চলে যে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য দেখা যায় যার মধ্যে শাল, সেগুন, মেহগনি প্রভৃতির আধিক্য বেশি। মোটামুটি ৩০০০ ফুট-৭৫০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত অর্ধচিরহরিৎ এবং চিরহরিৎ উদ্ভিদবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়—যার মধ্যে পাইন, দেবদারু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আবার ৭৪০০-১০,৫০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত উদ্ভিদবৈচিত্র্য পার্বত্য আলপাইন প্রকৃতির, যার মধ্যে ম্যাপল, ওক, জুনিপার প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।

স্বাভাবিক ভাবেই, প্রাণীবৈচিত্র্যেও পুরো হিমালয় এক ভূ-স্বর্গ। এখানে পাদদেশ থেকে শুরু করে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ড এভারেস্ট পর্যন্ত কোন না কোনও প্রাণীর দেখা মেলে। তুষারচিতা, হিমালয়ের নীলগাই, গোরাল প্রভৃতি প্রাণীগুলি মাউন্ট এভারেস্ট এবং তার সংলগ্ন বনাঞ্চলে একেক সময়ে দেখা যায়।

আজ গোটা বিশ্বজুড়েই প্রাকৃতিক সাম্যাবস্থা অস্থির। জলবায়ু ও আবহাওয়ার অসময়ে পরিবর্তন, বিশ্ব গড়তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রকার দূষণের বাড়বাড়ন্ত, মনুষ্যজাতির বিবেচনাহীন কার্যকলাপ প্রভৃতির কারণে সারা বিশ্বের সাথে হিমালয়ের জৈববৈচিত্র্যের উপর কুপ্রভাব পড়ছে। ফলস্বরূপ, বহু বন ও বন্যপ্রাণী আজ বিপন্ন। বিপন্ন হিমালয়ের কোলে অবস্থিত মানুষের জীবন ও জীবিকা।

হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৩০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৯৮০ প্রজাতির পাখি (যেখানে গোটা ভারতে প্রায় ১৩৩৯ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়), ১৭৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ১০৫টি প্রজাতির উভচর, ২৭০ প্রজাতির মাছ প্রভৃতি এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তালিকাবদ্ধ করা সম্ভবপর হয়েছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান এর চেয়ে আরও বেশ কিছু প্রজাতির ছোট/বড় স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ, উভচর, মাছ ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ থাকতে পারে যাদের খোঁজ সেভাবে এখনও সম্ভবপর হয়নি।

আসলে, হিমালয়ের এমন বেশ কিছু দুর্গম জায়গা রয়েছে, যেখানে গবেষণার কাজ চালানো ভীষণই কঠিন ও সমস্যাজনক। যদিও প্রচেষ্টা এখনও জারি আছে। গত ১৯৯৮ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ৩৫৩টি নতুন প্রজাতির জীব আবিষ্কৃত হয়, গড়ে ৩৫টি করে প্রতি বছর। এর মধ্যে ২৪২টি উদ্ভিদ, ১৪টি প্রজাতির মাছ, ১৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ১৬ প্রজাতির উভচর, ২ প্রজাতির পাখি, ২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী এবং অন্ততঃ ৬১ প্রজাতির অমেরুদণ্ডী নতুন প্রাণীর খোঁজ পাওয়া যায়।

এক ঝলকে হিমালয়ের উল্লেখযোগ্য বিপন্ন প্রাণীরা

হিমালয়ের আশপাশের বিভিন্ন দেশগুলোর সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পাওয়া বন্যপ্রাণীগুলোকে গোষ্ঠীবদ্ধ করে জানার চেষ্টা করি—

স্তন্যপায়ী : হিমালয়ের বেশ কিছু স্তন্যপায়ী আজ এন্ডেমিক প্রজাতি। হিমালয়ের এই স্তন্যপায়ীদের মধ্যে কাশ্মিরী মাস্ক হরিণ (*Moschus cupreus*), কাশ্মিরী মারখোর (*Capra falconeri*), কাশ্মিরী লাল হরিণ বা হাঙ্গুল (*Cervus elaphus hanglu*), হিমালয়ের বাদামি ভাল্লুক (*Ursus arctos isabellinus*) প্রভৃতি মূলত পশ্চিম হিমালয়ের কাশ্মির উপত্যকায় দেখা যায়। পুরো তিব্বতী পার্বত্য এলাকা জুড়ে তুষারচিতা (পশ্চিম ও মধ্য হিমালয়) (*Uncia*

তুষার চিতা

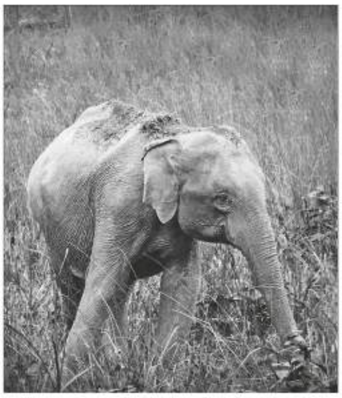
এশিয় হাতি

দৈত্যকার পাণ্ডা

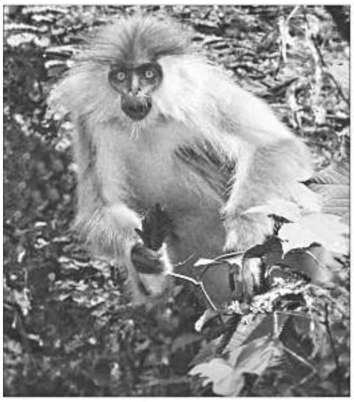
টুপি লাঙ্গুর

উড়ন্ত কাঠবিড়ালি

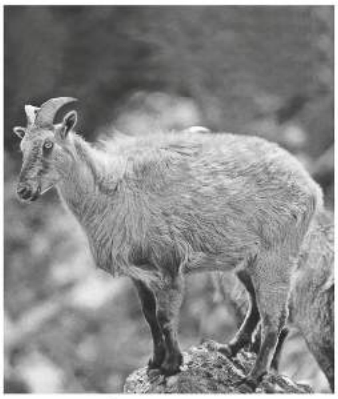
হিমালয়ের থর

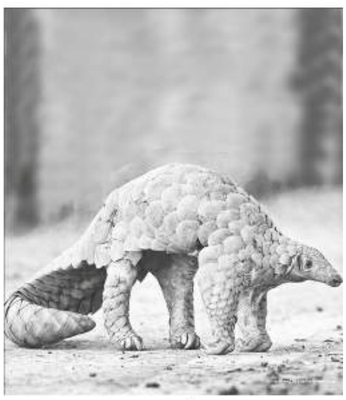
বনরুই

uncia), রেড ফক্স (*Vulpes vulpes*), নীল ভেড়া (*Pseudois nayaur*), পাহাড়ী ভেড়া (Tibetan argali–*Ovis ammon*), এশিয়াটিক আইবেক্স (*Capra sibirica*) প্রভৃতি স্তন্যপায়ী এক সময় দেখা গেলেও আজ এরা অত্যন্ত দুর্লভ প্রাণীরূপে চিহ্নিত। বিশেষ করে 'তুষার চিতা'—এতটাই দুর্লভ যে এদের অদৃশ্য পাহাড়ী ভূত (Mountain ghost) নামে অভিহিত করা হয়। হিমালয়ের কালো ভাল্লুক ও (Himalayas Asiatic Black Bear–*Ursus thibetanus*) এখন বিপন্নতার গ্রাসে। হিমালয়ান টার/নীল গাই (*Hemitragus jemlahicus*), হিমালয়ান গোরাল (*Naemorhedus goral*) এবং হিমালয়ান সেরু (*Capricornis sumatraensis*) ছাগল/ভেড়া/গরু জাতীয় পাহাড়ী স্তন্যপায়ী যা ধীরে ধীরে দুর্লভ হয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে বুনো চমরী গাই (Wild yak–*Bos grunniens*), তিব্বতী গেজেল (*Procapra picticaudata*), কাশ্মিরী মারখোর এবং হাঙ্গুল/কাশ্মিরী স্ট্যাগ সংখ্যায় কয়েকশো রয়ে গেছে হিমালয়ের সীমাবদ্ধ কয়েকটি জায়গায়। অদ্ভুদ দর্শনধারী ছাগল-হরিণ মিশ্রিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত 'ট্যাকিন' হিমালয়ের অন্যতম বিপন্ন তৃণভোজী প্রাণী। এর চারটি উপপ্রজাতি— ১. গোল্ডেন ট্যাকিন—*Budorcas taxicolor bedfordi*—কুইমাউন্টেন, চিন ২. মিশমি ট্যাকিন —*Budorcas taxicolor taxicolor*—ভারতের অরুণাচল প্রদেশের মিশমি হিল, মায়ানমার ও চিন। ৩. সিচুয়ান ট্যাকিন—*Budorcas taxicolor tibetana*—তিব্বত ও সিচুয়ান প্রদেশ, চিন এবং ৪. ভুটান ট্যাকিন—*Budorcas taxicolor white*—ভুটান, উত্তরপূর্ব ভারত, তিব্বত ও চিন। এটি ভুটানের রাষ্ট্রীয় প্রাণী।

পূর্ব হিমালয়ের গোল্ডেন লাঙ্গুর (Gee's Golden Langur–*Trachypithecus geei*) এবং টুপিলাঙ্গুর (Capped Langur–*Trachypithecus pileatus*) দুটি দুর্লভ প্রজাতির লাঙ্গুর। এর মধ্যে গোল্ডেন লাঙ্গুর অত্যন্ত বিপন্ন কেবলমাত্র ভুটান ও আসামের বনাঞ্চলে দেখা যায়।

উল্লুক বানর বা লেসার এপদের মধ্যে ১. ওয়েস্টার্ন হুল্লোক গিবোন—*Hoolock hoolock*—আসাম, মিজোরাম, মেঘালয়, বাংলাদেশ ও মায়ানমার।

২. ইস্টার্ন হুল্লোক গিবোন—*Hoolock leuconedys*—ইউনান প্রদেশ, চিনেই পাওয়া যায়। গত এপ্রিল ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্রে প্রাইমেটোলজিস্ট স্বীকার করে নিয়েছেন যে ভারত থেকে এটি সম্পূর্ণ লুপ্ত।

৩. স্কাইওয়াকার হুল্লোক গিবোন—*Hoolock tianxing*-2017 সালে আবিস্কৃত উল্লুক বানরের নতুন প্রজাতি—চিন ও মায়ানমারে পাওয়া যায়।

হিমালয়ের অপেক্ষাকৃত পাদদেশ ও সমতল ভূভাগে যে সমস্ত শাকাষী স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বিপন্ন তারা হল—সাম্বার হরিণ—(*Rusa unicolor*) হরিণদের প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড়, কাকর হরিণ (Muntjac/Barking Deer–*Muntiacus muntiac*), পাড়া হরিণ—(Swamp Deer/Barasingha–*Rucervus duvaucelii*)। জলা বুনো মোষ—(Asian Wild water Bufallo–*Bubalus arnee*) কেবলমাত্র আসামেই সীমাবদ্ধ হিসপিড খরগোশ— *Caprolagus hispidus* অত্যন্ত দুর্লভ ছোট স্তন্যপায়ী।

হিমালয়ের উল্লেখযোগ্য শিকারী/মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের যারা বিপন্ন তারা হল—

অত্যন্ত দুর্লভ তুষার চিতা (Snow leopard–*Uncia uncia*), আমচিতা (Clouded leopard–*NeeFelis nebulosa*), তিব্বতী নেকড়ে (Tibetan Wolf–*Canis lupus chanko*), ধোল/বুনোকুকুর (Wild Dog–*Cuon alpinus*), চিতাবাঘ (Indian Leopard–*Panthera pardus*), লাল শেয়াল (Red Fox–*Vulpes vulpes*), চিতা বিড়াল (Leopard Cat–*Felis bengalensis*), জংলী বিড়াল (Jungle cat–*Felis chaus*), হিমালয়ের বাদামি ভাল্লুক (Himalayan Brown Bear–*Ursus arctos wabellinus*), হিমালয়ের কালো ভাল্লুক (Himalayan/Asian Black Bear–*Ursus betanus*), হিমালয়ের হলুদ বুক মার্টিন (Himalayan yellow throated Marten–*Martes havigula*), মসৃণ উদবিড়াল (Smooth coated Otter–*Lutrogale perspicillata*), বনরুই (প্যাঙ্গোলিন–*Manis crassicaudata*), গাঙ্গেয় শুশুক (Gangetic Dolphin–*Platanista gangetica*), ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডার (Great Indian one horned Rhinoceros–*Rhinoceros unicornis*), বঙ্গীয় বাঘ (Royal Bengal Tiger–*Panthera tigris tigris*), দক্ষিণ চিনীয় বাঘ (South Chinese Tiger–*Panthera tigris*) অত্যন্ত দুর্লভ, ইন্দোচিনীয় বাঘ (*Panthera tigris*), এশিয় হাতি (Asian Elephant–*Elephas maximus*), ভারতীয় বাইসন/গৌড় (Indian Prison/Gaur–*Bos gaurus*) অত্যন্ত দুর্লভ দৈত্যাকার পান্ডা (Giant Panda–*Ailuropoda melanoleuca*) কেবলমাত্র চিনেই পাওয়া যায় এবং লাল পান্ডা (Red Panda–*Fulgens*) প্রভৃতি। পূর্ব হিমালয়ে নামদাফা জাতীয় উদ্যান থেকে নামদাফা উড়ন্ত কাঠবিড়ালি (*Biswamoyopterus biswasi*) অত্যন্ত বিরল।

পাখি : এখানে ৯৮০ প্রজাতির পাখিদের মধ্যে ১৫টি প্রজাতিকে এখানকার বিরল ও সীমাবদ্ধ প্রজাতি রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। বার্ড লাইফ ইন্টারন্যাশনাল, মোটামুটি হিমালয়ের চারটি অঞ্চলকে Endemic Bird Area (EBA) রূপে চিহ্নিত করেছেন যারা আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এখানে বিভিন্ন প্রকার ফিজেন্ট (Pheasant—রঙিন মুরগী জাতীয়), ট্রাগোপান (Tragonan—একই), ধনেশ জাতীয় (Hornbill), বেশ কিছু ছোট পাখি আজ বিপন্নতার দোরগোড়ায়। যে সমস্ত পাখি হিমালয়ে আজ সংকটগ্রস্ত কিংবা বিপন্ন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

অত্যন্ত লুপ্তপ্রায় হিমালয়ের কোয়েল (Himalayan Quail–*Ophrysia superciliosa*) অনেকে এটাকে লুপ্ত মেনে নিয়েছেন। শেষ নৈনিতালের আশপাশে ২০০৩ সালে দেখা গেছে বলে বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন। ২০০৩ থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর অবধি না দেখা গেলে তবে সরকারি ভাবে এটাকে লুপ্ত ধরা হবে।

বাদামি গলা ফুটকি (RuFous-throated wren babbler–*Spelaeornis caudatus*), দুর্লভ পাটকিলে ধনেশ (Rufous necked

হিমালয়ের গ্রিফোন শকুন

পলাশ মেছো ঈগল

পাটাকিলে ধনেশ

হিমালয়ের কোয়েল

হিমালয়ের মোনাল

এশিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাই ক্যাচার

গ্রেট বারবেট

Hornbill–*Aceros nipalensis*), স্ল্যাটার মোনাল (*Lophophorus sclateri*), বাদামি গলা তিতির (Chestrut breasted patridge–*Arborophila mandellii*), সাদা পেট বক (White bellied heron–*Ardea insignis*), ব্লিথ ট্র্যাগোপান (*Tragopan blythi*), ওয়ার্ডস ট্রগোন (*Harpactes wardi*), হিমালয়ের তুষার মোরগ (Himalayan Snow Cock–*Tetraogallus himalayensis*), তুষার তিতির (Snow Patridge–*Lerwa lerwa*), পশ্চিমি ট্র্যাগোপান (Western Tragopan–*Tragopan melanocephalus*), চিরফিজেন্ট (Cheer pleasant–*Catreus wallichi*), কোকলাস ফিজেন্ট (Koklass pheasant–*Pucrasia macrolopha*), হিমালয়ের মোনাল (Himalayan Monal–*Lophophorus impetanus*), তিব্বতী তুষার মোরগ (Tibetan Snow Cock–*Tetraogallus tibetanos*), পাহাড়ী তিতির (Hill patridge–*Arborophila torqueola*), ব্লাড ফিজেন্ট (Blood phaseant–*Ithaganis creuntus*), হিমালয়ের গ্রিফোন শকুন (Himalayan grifon Vulture–*Gyps himalayaensis*) এবং পলাশমেছো ঈগল (Pallas's Fish Eagle–*Haliaeelus leucoryphus*)।

সরীসৃপ : পুরো হিমালয় অঞ্চল জুড়ে ১৭৫টি সরীসৃপের মধ্যে প্রায় ৫০টি কেবলমাত্র এখানেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ এন্ডেমিক প্রজাতি। এখানে সরীসৃপ নিয়ে এখনও অনেক গবেষণা প্রয়োজন। যে সকল প্রজাতির সরীসৃপ এখানে বিপন্নপ্রায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—মিকটোফোলিস গিরগিটি—*Mictopholis austeniana* সদ্য আবিস্কৃত

মিকটোফোলিস গিরগিটি

ঘড়িয়াল

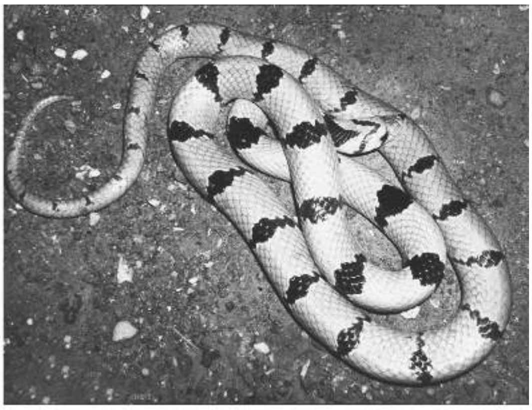

কুকরি সাপ

Banded Kukri–*Oligodon arnensis*), বেন্টটোড গেকো/ফরেস্ট গেকো (Bent toed Gecko/Forest Gecko–*Cyrtodactylus* spp.), টোকে গেকো—(Tokay Gecko–*Gecko gecko*), জাপালুরা গিরগিটি (Japalura lizard–*Japalura* spp.), ভারতীয় অজগর (Indian Rock Python–*Python molurus*) অত্যন্ত দুর্লভ ঘড়িয়াল—Gharial/Gavial/Fish eating Crocodile–*Gavialis gangeticus*) প্রভৃতি।

সিকিম ইকথিওফিস

ব্যাঙ (নেনোরামা মিনিকা)

হিমালয়ের নিউট

প্যাঙ্গন হ্রদে বাদামি মাথার গাঙচিল, এরা উচ্চ পার্বত্য হ্রদে ডিম পারে।

ছবি : সন্দীপ সাহা

উভচর : হিমালয়ের এখনও পর্যন্ত আবিস্কৃত ১০৫ টির মত উভচরের মধ্যে অন্ততঃ ৪০টি প্রজাতি এখানকার নিজস্ব বা এন্ডেমিক প্রজাতি। সাপের মত কোন পদবিহীন উভচর যাদের জীববিদ্যার পরিভাষায় সিসিলিয়ান বলা হয়—পুরো হিমালয় জুড়ে দুটি প্রজাতির হদিশ পাওয়া গেছে যার মধ্যে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কেবলমাত্র এখানেই পাওয়া যায়—সিকিম ইকথিওফিস (*Ichthyophis sikkimensis*) হল একটি উল্লেখযোগ্য উভচর। এছাড়া *Nanorana* গণের অধীনে কয়েকটি ব্যাঙের প্রজাতি যেমন— *Nanorana minica* বিপদগ্রস্ত প্রজাতি রূপে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। পুরো ভারতের একমাত্র লেজ যুক্ত ব্যাঙ হিমালয়ান নিউটস্যালাম্যান্ডার—*Tylototriton verrucossus* পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায় যা অত্যন্ত বিরল উভচর প্রজাতি। স্থানীয় জনমানসে 'গোরা' নামে পরিচিত এই প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য সারা এশিয়ার একমাত্র স্যালাম্যান্ডার অভয়ারণ্য—জোরপোখরি স্যালাম্যান্ডার অভয়ারণ্য দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত।

মাছ : হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদী, ছোট বড় ঝোড়ায় যে সমস্ত মাছ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে আনুমানিক এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্রায় ২৭০ প্রজাতির হদিশ পেয়েছেন যার মধ্যে অন্ততপক্ষে ৩০টি প্রজাতি এখানেই সীমাবদ্ধ প্রজাতি, যার পোশাকি নাম 'এন্ডেমিক প্রজাতি'। এর মধ্যে বেশ কিছু কার্প, নোচ এবং ক্যাটফিস বিপন্ন প্রজাতি স্নো-ট্রাউট জাতীয় মাছ *Schizothorax* পাহাড়ী হ্রদে এবং ঝোড়ায় দেখতে পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠীর অপর দুটি এক প্রজাতি *Ptychobarbus* এবং লাদাখের *Gymnocypris biswasi* মনে করা হচ্ছে যা ইতিমধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। আর বেশ কিছু প্রজাতি লুপ্ত হওয়ার দোরগোড়ায় তার মধ্যে হিমালয়ান সোনালি মহাশির (Golden Masheer–*Tor putitora*) উল্লেখযোগ্য।

একমাত্র হলোটাইপ প্রজাতি। উদয়কাল কুকরি সাপ—(Common Kukri/

অমেরুদণ্ডী : বহু পোকামাকড়, প্রজাপতি, শামুক প্রভৃতি কমবেশি হারিয়ে যাচ্ছে এইসব অঞ্চল থেকে। সেই অর্থে এদের নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি এখনও পর্যন্ত। সিকিম সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ইদানিং এদের নিয়ে কাজ করছেন।

বিপন্নতার কারণ

কেন এই সকল প্রাণীকে আমরা হারাতে বসছি বা প্রতিনিয়ত হারাচ্ছি—তার সুনির্দিষ্ট অনেকগুলো কারণ আছে। একবার এই কারণগুলোর দিকে নজর দেওয়া যাক—

জনসংখ্যার অত্যধিক বিস্ফোরণ

হিমালয় অঞ্চলের প্রায় ৫০০ কিমি. বেধ জুড়ে জনসংখ্যার চাপ একপ্রকার অসম্ভব। এই সমস্ত মানুষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মানুষের খাদ্য, পানীয় জল, আশ্রয়স্থল এবং শিল্পের প্রয়োজন ব্যাপক অংশে প্রাকৃতিক চাপ বাড়ছে। অবশ্য এটি সারা পৃথিবীর একটি সাধারণ সমস্যা হলেও এখানে যথেষ্টই প্রকট। হিমালয় অঞ্চলের একটা বড় অংশ জুড়ে বন ও পাহাড় কেটে বসতিস্থাপন ও শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্যের জন্য স্থানীয় আদিবাসি সম্প্রদায় যেমন—বন্যপ্রাণী ও অন্যান্য উদ্ভিদ ব্যবহার করছেন, পাশাপাশি এই চাহিদা বাইরে মেটাতে পাচারচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। চাষবাস, বাঁধ নির্মাণ, শিল্পকারখানা তৈরি করতে ব্যাপক অংশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আজ ধ্বংসপ্রায়। বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রামবাসীরা তাঁদের গবাদি পশুর একটা বড় অংশ বনের নিজস্বতা ধ্বংস ও নানা প্রকার 'জুনোটিক রোগ' বন্যপ্রাণীদের মধ্যে ছড়াতে ও তাঁদের খাদ্যে ভাগ বসাতে সাহায্য করে।

মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত

বন্য সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারীদের সাথে বন্যপ্রাণীদের সংঘাত ক্রমশঃ বেড়ে চলছে। কখনও বন্যপ্রাণীরা অবৈধভাবে প্রবেশকারী কিংবা সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষদের মেরে ফেলে। অপরদিকে স্থানীয়রা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে জান-মান বাঁচাতে—গৃহপালিত পশু বাঁচাতে হিংস্র বন্যপ্রাণীদের বিভিন্ন ভাবে মেরে ফেলেন। কখনও খাবারে বিষ মিশিয়ে, কখনও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। ইলেকট্রিক শক দিয়েও মেরে ফেলা কিছু কিছু জায়গায় ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে।

বন্যপ্রাণী পাচারচক্র

বহু সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হলেও বন্যপ্রাণী পাচারচক্রের কার্যকলাপ আজও কমবেশি অব্যাহত। এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা কিন্তু রাষ্ট্রনায়করা খুব বেশি সংবেদনশীল নন বলেই আমার ধারণা। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন— চিন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, লাওস প্রভৃতি দেশে আজও বন্যপ্রাণীর বিভিন্ন দেহাংশ খোলাবাজারেও কেনাবেচা চলে। কিছু ভুল, অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে হাতির দাঁত, বাঘের দাঁত, নখ, লোম, গোঁফ, অন্ত্রনালী; গন্ডারের খড়্গ; ভাল্লুকের পিত্তথলি; প্যাঙ্গোলিন-এর চামড়া সহ অন্যান্য অংশ; বাঘ, চিতাবাঘ, তুষার চিতা, আমচিতা প্রভৃতির মাংস ও চামড়া, টোকে গেকোর লেজ ও দেহাংশ প্রভৃতির জন্য বহু বন্যপ্রাণী আজও চোরাপথে শিকার করা হয়। বহু পাখি ধরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কেনাবেচা করা হয়। ইতিপূর্বে এই করেই ভারতে সারিস্কা ব্যাঘ্র বন থেকে সম্পূর্ণ বাঘ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ২০০৫-২০০৬ সালে এবং বহু বনাঞ্চল থেকে আজও এগুলি প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছে। ভারতের বাইরে চিনে, কোরিয়া, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে এই সমস্যা আরও প্রকট।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন

একথাও ঠিক যে প্রাকৃতিক নিয়মে যুগে যুগে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তিত হয়েছে নিজেদের প্রয়োজনে। কিন্তু এইক্ষেত্রে আমরা তথাকথিত উন্নত মানুষরা এই পরিবর্তনের হারকে আরও ত্বরান্বিত করছি নিজেদের অবিবেচক-অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের জন্য। যার ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে পাঁচবার মহাজাগতিক ধ্বংসপ্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে যে সময়কালে তার তুলনায় আমরা সম্ভবত ষষ্ঠ মহাজাগতিক ধ্বংস প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে আসছি দ্রুতহারে যা কখনই কাম্য ছিল না।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য সৃষ্ট কারণ যেমন— আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, সুনামী, দূষণ, পরমাণু বিস্ফোরণ, অত্যধিক হারে সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রাণীর শিকার, শিল্পকারখানার প্রসার, পথঘাট-অট্টালিকা নির্মাণ, কৃষিকাজে ব্যাপক কীটনাশকের ব্যবহার প্রভৃতি সারা পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর কু-প্রভাব ফেলেছে—যার দরুন আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত অস্থিরতা সারা পৃথিবী জুড়ে ক্রমশ বর্ধমান। ধীরে ধীরে আবহাওয়া পরিবেশগত কারণে উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলছে যাদের 'Environmental Refugee' বলা হচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এর কু-প্রভাব হিমালয়ের বন ও বন্যপ্রাণীর উপরও এসে পড়ছে।

বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস

একটার পর একটা বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল ধীরে ধীরে ধ্বংস করা হচ্ছে। এই চিত্রটি হিমালয়ের সাথে গোটা বিশ্বেরও। আবাসস্থল ধ্বংস ও খাদ্য-খাদকের শৃঙ্খলের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার জন্য আজ বন্যপ্রাণীরা বিপন্ন বা বিপদগ্রস্ত। অনেকে ইতিমধ্যে হারিয়েও গেছে।

তাহলে কী করণীয়

হিমালয় অঞ্চল জুড়ে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সীমানা একে অপরের সীমা ছুঁয়ে গেছে। হিমালয়ের বেঁচে থাকা, জৈববৈচিত্র্য তথা এই সকল দুর্লভ বন ও বন্যপ্রাণী বাঁচাতে হলে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে—

★ প্রথম কাজ হচ্ছে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাবে হিমালয়ের কোলে এবং আশপাশে অবস্থিত দেশগুলোর পারস্পরিক আন্তরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছা। হিমালয়ের জৈববৈচিত্র্য বাঁচাতে বন্যপ্রাণীর দেহাংশের পাচার রোধ এবং সংরক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে প্রয়োগ করতে এটা অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপ হতে পারে।

★ বিভিন্ন দেশের সমস্ত সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলোতে যথাযথ নজরদারি, পারস্পরিক সহযোগিতা, পর্যাপ্ত বনকর্মী/সুরক্ষাকর্মী ও তাঁদের প্রয়োজনীয়

অপরিহার্য সরঞ্জাম সহ উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

★ বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী/বনাঞ্চলের মধ্যে থাকা বনবাসীদের উপযুক্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে স্থানীয়দের বন রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অংশীদারিত্ব বাড়িয়ে দেওয়া। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ভারতে ইতিমধ্যে প্রায় একইরকম ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যৌথ বন পরিচালনা (Joint Forest Management) প্রচলিত। এরই অঙ্গ হিসেবে বন সুরক্ষা কমিটি (Forest Protection Committee–FPC), বাস্তু উন্নয়ন সমিতি (Eco Developent Committee–EDC), সাম্প্রদায়িক কাজে রক্ষিত অঞ্চল (Community Reserve), বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ প্রভৃতি ব্যবস্থাপনা ভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চলে লাগু আছে। এটা যেমন আনন্দের খবর, তেমনি আবার বহু জায়গায় বিশেষ করে হিমলায় অঞ্চল জুড়ে পর্যাপ্ত নজরদারীর অভাব এবং অনুৎমাছের জন্য প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এটা অত্যন্ত বেদনার। প্রয়োজন এই ব্যবস্থাপনাগুলোকে আন্তরিকতা দিয়ে আরও সুদৃঢ় করা, উন্নত করা, চালু করা ও জারি রাখা। ইতিমধ্যে কাশ্মির ও হিমাচল প্রদেশে সম্প্রদায়গত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ধারণা সাফল্য পেয়েছে পুরো হিমালয় জুড়ে এটাকে ছড়িয়ে দিতে পারলে, ধরে রাখতে পারলে; বিশেষ করে পূর্ব হিমালয় অংশে তাহলে আরও সাফল্য আসবে।

★ প্রজাতি ভিত্তিক সংরক্ষণ প্রকল্প আরও চালু করা দরকার। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন দেরিতে হলেও তুষার চিতা নিয়ে Snow Leopard Project (SLP)-2006, Hangul Project (HP)-2008, Tiger Project (TP)-1973, Rhinocoros Project)-(Indian Rhino Mission-2020) প্রভৃতি আরও বেশি করে বিপন্ন/বিপদগ্রস্ত প্রজাতিদের নিয়ে চালু করা দরকার।

★ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সীমানা আরও বাড়ানো দরকার। বনাঞ্চলের সাথে লাগোয়া বনবস্তি ও সংলগ্ন জনবসতিগুলোতে পশুচারণ ও গবাদি পশুপালন সংক্রান্ত কিছু নীতি নির্দেশিকা আরও জারি করা দরকার এবং স্থানীয় মানুষকে জড়িয়ে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা দরকার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, হিমাচল প্রদেশের 'কিবার বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য'-এ এই ব্যবস্থাপনা অতিসম্প্রতি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে।

★ হিমালয়ে বিভিন্ন ঔষধি ও সুগন্ধি তৈরি হয় এমন গাছগাছালি নিয়েও স্থানীয় মানুষকে জড়িয়ে সংরক্ষিত অঞ্চলের বাইরের এলাকা (বাফার জোন) গুলোতে জৈবকৃষি করা যায় যেখানে স্থানীয় লোকের অংশদারিত্ব বাড়বে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে, ফলে বনাঞ্চলের উপর চাপ কমবে। ঠিক এমনটা ইদানিং উত্তরাখণ্ড সরকার কোন কোন এলাকায় চালু করেছেন। প্রয়োজন আরও ব্যাপক।

★ স্থানীয় এলাকার মানুষের মধ্যে জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে লাগাতার ধারাবাহিক ভাবে সচেতনতা প্রচার অভিযান করে যেতে হবে, প্রয়োজনে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কিংবা বেসরকারি সংগঠনগুলোর সহায়তায়।

★ উত্তরপূর্ব ভারতের বনাঞ্চল এলাকা ও জৈববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাগুলোতে কোনরকম খনন/উত্তোলন কার্য/বাঁধ নির্মাণ অতি শীঘ্রই বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ।

একঝলকে হিমালয় অঞ্চলের কিছু উল্লেখযোগ্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল—

★ ঈগলনেস্ট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (অরুণাচল প্রদেশ, ১২০ বর্গকিমি.)
- মেহাত্ত বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (অরুণাচল প্রদেশ, ১১০ বর্গকিমি.)
- কামলাং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (অরুণাচল প্রদেশ, ৭৮০ বর্গকিমি.)
- মৌলিং জাতীয় উদ্যান (অরুণাচল প্রদেশ, ২০০ বর্গকিমি.)
- নামদাফা জাতীয় উদ্যান (অরুণাচল প্রদেশ, ১৯৮৫ বর্গকিমি.)
- রয়্যাল মানস জাতীয় উদ্যান (ভুটান, ৪১০ বর্গকিমি.)
- তোরসা স্ট্রিক্ট নেচার রিজার্ভ (ভুটান, ৬৫১ বর্গকিমি.)
- জিগমে দোরজি জাতীয় উদ্যান (ভুটান, ৫৬০ বর্গকিমি.)
- থ্রুম্বসিঙ্গলা জাতীয় উদ্যান (ভুটান, ৩১০ বর্গকিমি.)
- বুকডেলিং, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ভুটান, ৩৯০ বর্গকিমি.)
- জিগমে সিংঘে ওয়ানচুক জাতীয় উদ্যান (ভুটান, ৬০০ বর্গকিমি.)
- নামদাফা জাতীয় উদ্যান (ভুটান, ১৫৮০ বর্গকিমি.)
- শিবপুরী নাগার্জুন জাতীয় উদ্যান (নেপাল, ১৫৯ বর্গকিমি.)
- মাকালু-বরুণ জাতীয় উদ্যান (নেপাল, ১৫০০ বর্গকিমি.)
- নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান (পশ্চিমবঙ্গ, ৮৮ বর্গকিমি.)
- সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান (পশ্চিমবঙ্গ, ৭৯ বর্গকিমি.)
- চায় নেচার রিজার্ভ (তিব্বত, ৩২০ বর্গকিমি.)
- দাচীগাম জাতীয় উদ্যান (জম্মু-কাশ্মির)

উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত বনাঞ্চলে হিমালয়ের অত্যন্ত দুর্লভ ও বিপন্ন প্রাণীদের মধ্যে অধিকাংশের বসবাস। এইসব বনাঞ্চলের সুরক্ষা ও সংরক্ষণে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

নতুন কিছু প্রজাতির সাম্প্রতিক অতীতে আবিস্কার হিমালয় অঞ্চল থেকে

স্তন্যপায়ী : ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে ৩টি নতুন স্তন্যপায়ী পাওয়া গেছে যেমন—
- পাতা হরিণ (Leaf Deer–Muntiacus putaoensis)
- অরুণাচল বানর (Arunachal Macaque–*Macaca munzala*)
- নামদাফা উড়ন্ত কাঠবিড়ালি (Namdhapa Flying Squirre–*Biswamoyopterus biswasi*)

পাখি : ইতিমধ্যে দুটি নতুন প্রজাতি পাওয়া গেছে—
- বুগুন লিওকিকলা (Bugun Liocichla– *Liocichk bugunotum*)
- থ্রি ব্যান্ডেড রোসাফিঞ্চ (Three Branded Rosafinch–*Carpodacus trifasciatus*)

উভচর : ১৬টি নতুন উভচরের প্রজাতি পাওয়া গেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—
- চিত্ওয়ান নেপালি ব্যাঙ (*Hylarana chiturnensis*)
- স্মিথ্স লিটার ব্যাঙ (*Leptobrachium smithi*)

সরীসৃপ : ১৬টি নতুন প্রজাতির সরীসৃপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—
- Emarald green Pitvipet–(*Trimeresurus gumprechti*)
- Zaw's wolf Snake (*Lycodon zawi*)

মৎস্য ঃ মোটামুটি ১৪ রকমের মাছেদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—
- Small bagrid Catfish–(*Batasio macronotus*)
- Orange of spotted Snakehead fish–(*Channa autantimaculat*)

email : rajarouthbhbl@gmail.com • M. 9474417178

প্রচ্ছদ কথা ৫

জয়শ্রী দত্ত

হিমালয়ের ওষধী গাছ

হিমালয়ের ওষধী গাছ নিয়ে লিখতে গেলেই যে প্রশ্নটা প্রথম আসে সেটা হল কোন কোন গাছের কথা লিখব আর কোন কোন গাছের কথা লিখব না। শেওলা, ছত্রাক, লাইকেন থেকে শুরু করে বীরুৎ, গুল্ম, বৃক্ষ—ওষুধ পাওয়া যায় সব কিছুতেই।

হিমালয়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে এখানকার গাছপালার বৈচিত্র্য অনেক বেশি। উষ্ণমণ্ডলীয় গাছপালা থেকে শুরু করে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গাছপালা বা অতি শীতল অঞ্চলের গাছপালাও দেখা যায় এখানে। হিমালয়ের গাছপালা মানে শুধু বরফঢাকা পাহাড়চূড়া আর তার আশপাশে গাছপালা নয়, পাদদেশের উষ্ণ অঞ্চলের গাছপালাও হিমালয়ের গাছপালার মধ্যেই পড়ে।

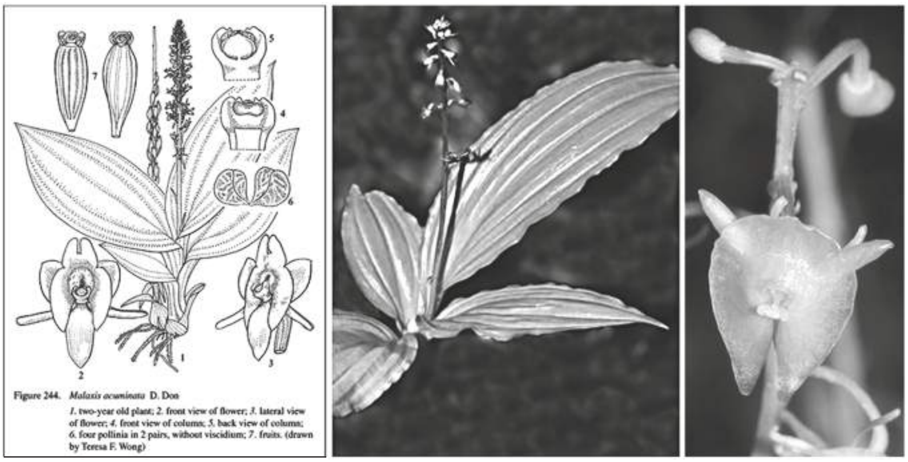

জীবক

হিমালয়ের ওষধী গাছ নিয়ে চর্চা, শুধু আধুনিক কালে নয়, এ'চর্চা বৈদিক যুগেও ছিল। সেই সময়ও হিমালয়ের ওষধী গাছ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'অষ্টবর্গ' ওষধী। এই অষ্টবর্গ ওষধী নিয়ে একটা গল্প আছে—চ্যবন ঋষি দীর্ঘদিন তপস্যার ফলে অতি নির্জীব, ক্ষীণজীবী, শীর্ণ, ক্লিষ্ট দেহ হয়ে পড়েন। তাঁর ঐ অবস্থা দেখে দেব ভিষগ অশ্বিনীকুমার ভাইদের খুব কষ্ট হয়। তাঁরা হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে নানা ওষধী গাছপালা নিয়ে আসেন, তারপর সেইসব গাছপালা থেকে মোট আটটা গাছ আলাদা করে বেছে নেন। সেইসব গাছগুলোকে তাঁরা মোট তিনটে ভাগে ভাগ করেন। প্রথম ভাগে ছিল জীবনী শক্তি আর সংক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি বাড়ানোর গাছ। দ্বিতীয় ভাগের গাছগুলো ছিল মাংসপেশী বৃদ্ধি ও নতুন কোষ বৃদ্ধির জন্য, এরা বৃদ্ধ বয়সেও কার্যকরী হয়। শেষ ভাগের গাছগুলো ছিল বিপাকীয় ক্রিয়া বৃদ্ধি বিশেষত পুষ্টিকর পদার্থ থেকে প্রোটিন সৃষ্টির গঠনমূলক প্রক্রিয়া বৃদ্ধি (anabolism) এবং পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা (male fertility) বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য। আটটা গাছকে একসঙ্গে মিশিয়ে যে ওষুধ তারা তৈরি করেছিলেন, সেই ওষুধ খেয়ে ঋষি চ্যবন ফিরে পান তাঁর যৌবনের দীপ্তি ও পূর্ণ কর্মক্ষমতা। অশ্বিনীকুমার ভাইরা ঐ ওষুধের নাম দেন 'চ্যবনপ্রাশ' ('প্রাশ' শব্দের অর্থ খাদ্য)। তার মানে 'চ্যবনের খাদ্য'। বর্তমানের বাণিজ্য সফল 'চ্যবনপ্রাশ' নামটা তার থেকেই এসেছে। ঠিক কোন আটটা গাছ দেব ভিষগেরা ব্যবহার করেছিলেন, তা আজ সঠিক জানা না গেলেও চরক সংহিতা আর পরবর্তী বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক পুঁথিপত্র থেকে যে আটটা গাছকে 'অষ্টবর্গ' গাছ বলে চিহ্নিত করা হয় সেগুলো হল—'জীবক', 'ঋষভক', 'কাকলী', 'ক্ষীরকাকলী', 'মেদা', 'মহামেদা', 'ঋদ্ধি' আর 'বৃদ্ধি'।

জীবকের বৈজ্ঞানিক নাম *Malaxis acuminata*, এটা অর্কিড গোত্রীয় গাছ; এই গোত্রের আর একটা গাছ হল ঋষভক, এর বিজ্ঞানসম্মত নাম *Malaxis muscifera*. দুটোরই মাটির তলার 'কন্দ' ওষধী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এই গাছদুটো পাওয়া যায় হিমালয়ের ৬০০ মিটার থেকে ৪০০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায়, পাহাড়ের ঢালে, বনের ভেতর, বড় গাছের তলায়, ঘাসের বনে।

এদের বেড়ে ওঠার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছায়াচ্ছন্ন আর্দ্র, জৈব মাটি (humus)। সাধারণত অর্কিড বড় গাছের ডালে ঝুলতে দেখা যায়। এরা অর্কিড হলেও মাটিতে জন্মায়। মাটিতে এদের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন এক বিশেষ ধরনের ছত্রাকের সহযোগিতা। এটাকে পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক বা Symbiotic relation বলা যায়। ছত্রাকগুলো জীবক বা ঋষভকের শেকড়ের বাইরের দিকের কোষগুলিতে নিশ্চিন্তে বেড়ে ওঠে, বিনিময়ে অর্কিডগুলোকে যোগায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি।

এই ওষধী গাছগুলো বেড়ে ওঠার জন্য আশেপাশের গাছপালার ওপর নির্ভরশীল, তাই এদের নিজস্ব জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় চাষ করা সম্ভব হয় না, আজ জঙ্গল থেকে অপরিণামদর্শী সংগ্রহ করার ফলে এরা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।

এদের বীজ থেকে নতুন গাছ তৈরি হতে পারে, আবার এপ্রিল মাসে মাটির তলার কন্দ থেকে নতুন অগ্রমুকুল বেরিয়েও নতুন গাছের সৃষ্টি হতে পারে। প্রথম দু'বছর গাছগুলোর অঙ্গজ বৃদ্ধি হয়। গাছে প্রায় গোলাকার অথবা লম্বাটে ডিম্বাশয়, অসম আকারের সবুজ রঙের অবৃন্তক দুটো করে পাতা হয়। বছর তিনেক পরে জীবক গাছে ১০ থেকে ১৫ সেমি লম্বা পুষ্পদন্ড বের হয়। ফুলগুলো হলদেটে সবুজ। জুলাই-আগস্ট মাসে গাছে ফুল ফোটে। ঋষভকের ফুল ফোটে মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত, তারপর গাছে ফল দেখা যায় নভেম্বর মাস পর্যন্ত। এর ফুলে হলদেটে সবুজ রঙের সঙ্গে লালচে বেগুনী আভাও দেখা যায়।

ঋদ্ধি

দুটো গাছের কন্দই জীবনী শক্তি বাড়ায়, হজম শক্তি বাড়ায়, সার্বিক স্বাস্থ্য ভাল করতে ও সংক্রমণ প্রতিহত করতে সাহায্য করে। ঋষভকের (*malaxis muscifera*) কন্দের যৌন উত্তেজক গুণও আছে।

অষ্টবর্গ গাছের আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ গাছ হল ঋদ্ধি (*Habenaria intermedia*) আর বৃদ্ধি (*Habenaria edgewarthii*)। এরাও অর্কিড গোত্রের গাছ (Family Orchidaceae)।

এই গাছদুটোও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুণসম্পন্ন, শারীরিক দুর্বলতা কমাতে সাহায্য করে।

২২০০ মিটার থেকে ৩০২৫ মিটার উচ্চতায় গাছদুটোকে দেখা যায়, এদেরও কন্দ ওষধী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শুক্রজ দুর্বলতায় (Seminal weakness) এরা কাজ করে। অষ্টবর্গ গাছগুলো একসঙ্গে ওষুধ তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে এই গাছগুলো নিয়ে গবেষণা চলছে।

গাছগুলো হিমালয়ের বনাঞ্চল থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয় বলে ধীরে ধীরে এরা নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে।

গাড়োয়াল হিমালয়ে বেড়াতে গেছেন অথচ ওক গাছ দেখেনি এমন মানুষ দেখা যাবে না। ওক গাছ দেখুক না দেখুক এই গাছের নাম শোনেনি এমন মানুষের সংখ্যা আরো কম।

অনেক রকম ওক গাছ আছে আমাদের হিমালয়ে। এখানে যেটার কথা লিখেছি সেটার বিজ্ঞানসম্মত নাম *Quercus infertoria*, গোত্র ফ্যাগেসি (Family Fagaceae)। ইংরেজিতে একে 'ওক গল ট্রি' বলে। বাংলা ও অন্যান্য বেশ কয়েকটা স্থানীয় ভাষায় একে মাজুফল বলে। এর বাণিজ্যিক নামও (Trade name) মাজুফল। এটা বড় গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ জাতীয় গাছ। চির সবুজ এই গাছটা লম্বা ১ মিটার থেকে ৪ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ছোট ছোট চারাগাছগুলো লালচে বা হলদেটে বাদামী রঙের হাল্কা রোঁয়ায় ঢাকা, পাতাগুলো পুরু, ডিম্বাকার বা বিডিম্বাকার, পাতার ধারগুলো ঢেউ খেলানো। সেই ঢেউ খেলানো ধারগুলো করাতের মতো খাঁজ কাটা।

জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত গাছে ফুল, ফল হতে দেখা যায়।

চারা অবস্থায় গাছের বাকলের ভেতরে Cynip's Gallae-tinctoria নামে এক ধরনের পোকা ডিম পাড়ে, পোকার সংক্রমণে গাছের ঐ জায়গাটা ফুলে উঠতে থাকে। পরিণত গাছে ঐ ফোলা জায়গাটা গোলাকার ফলের আকার ধারণ করে। ওটাকেই মাজুফল বলে। মাজুফল ওষধী হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যে কোন রকম রক্তপাত বন্ধের ওষুধ তৈরিতে মাজুফল ব্যবহার করা হয়। ফ্যারিনজাইটিস, ল্যারিনজাইটিস, টনসিলাইটিস ইত্যাদি গলার অসুখেও এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে এতে ইলাজিক অ্যাসিড, গ্যালো-ট্যানিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে।

চাষ করার জন্য অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওকের চারাকে মূল জমিতে বসিয়ে দিতে হয়। এর প্রধান মূল ক্ষতিগ্রস্ত হলে গাছটা বাঁচে না।

বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে এই ওক গাছটা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

এই গাছটা ধ্বংস হলে পোকাটা তার ডিম পাড়ার জায়গাটা হারাবে, আবার পোকাটা না থাকলে গাছটা বাঁচলেও 'ওক গল' তৈরি হবে না, ফলে ওষধী গুণের জন্যে পোকাটাকে বাঁচতে হবে।

হিমালয়ের ওষধী গাছের ভান্ডার অশেষ। সঠিক ভাবে বলতে গেলে এমন কোন গাছ নেই যেটা ওষধী নয়। হিমালয়ের ওষধী গাছগুলোর অনেকেই ওদের আশেপাশের গাছপালার সাহচর্য ছাড়া বাঁচে না ফলে ওদের সংগঠিত চাষ করা কঠিন হয়ে পড়ে, অনেক সময়ই এদের বন থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়। অনিয়ন্ত্রিত সংগ্রহের জন্য অনেক সময়ই অপরিণত কন্দ বা চারাগাছও উপড়ে ফেলা হয়, এই কারণে সে গাছ নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে।

হিমালয়ের ওষধী গাছ বাঁচাতে হলে বাঁচাতে হবে হিমালয়ের সমস্ত গাছপালা, বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্র্য। আজ ওষধী গাছ চেনার থেকেও জরুরী ওখানকার গাছপালার সংরক্ষণ। হিমালয় আমাদের সার্বিক সুর বলয়, নজর দিতে হবে সেই দিকে।

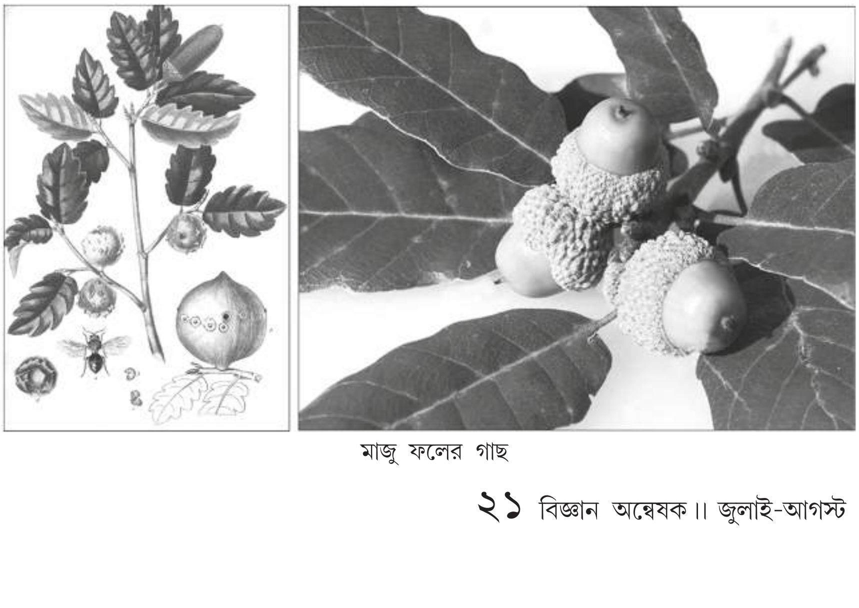

মাজু ফলের গাছ

email: joyashree.datta@yahoo.co.in
M. 9831060548

সুব্রত রুদ্র

আশ্বাস

সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের কাছাকাছি একটি মেয়ে আসছে
হিমালয়ের বুকের বাগানে এসে ফুল সংগ্রহ করবে
দীর্ঘপথ আসতে আসতে তারই শরীরের তাপ পেয়ে পেয়ে
পাহাড়ে উঠে আসছে পতঙ্গেরা
মেয়েটি পতঙ্গদের বলছে—আগে দেখি তপোবন
ঋষিদের কুটির কোথায়
কণ্বমুণি নাকি ছিল নন্দপ্রয়াগের ধারেকাছে
ব্যাসদেব যা যা দৃশ্য দেখতে দেখতে পথ পেরিয়ে গেছে
আমরা তার চেয়ে বেশি দেখতে দেখতে যাব
সকালে পাহাড়ের পায়ের নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে জলেরা
হিমের ঠান্ডায় তখন ওদের স্বর বেরোয় না
দুপুরে শুধু ঝির-ঝির ঝির-ঝির
বিকেল হতে না হতে ঘুম
তুলোর বড়ো বলের মতো শাদা অপরূপ একরাশ ফুল!
মেয়েটির দেখবার আগে দেখতে পেয়েছে পতঙ্গেরা
ফুলের ছোটো মুখের মধ্যিখানে অল্প বেগুনি আভা
সেই ফাঁকে ঢুকে পড়ে ফুলের ভেতরে পরানমাখা পায়ে।
ফুলের বুকের ওমে থাকার শান্তিতে,
বেরনোর পথ কোনদিন আর
মনে পড়ল না।
—অচেনা ফুলেদের জড়ো করে ফিরে যাবো, যারা দেখেনি কখনো
তাদের দেখাতে।
পাহাড়ের গভীর নির্জনতায় যে অজানা ফুলেরা ফোটে
তাদের স্বরূপে কি নিয়ে যেতে পারবো?
সেই রূপরঙের সামনে
নিজেই হারিয়ে গেলাম আমি।
চারপাশের এত সুন্দরতা
তা ছেড়ে ফিরতে মন চাইছে না
যেন ওই আকাশ থেকে বেঁচে থাকার আশ্বাসবাণী
এসে পৌঁছবে।

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

মহা-অচল

অচঞ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে—
ভাষাহীন অপরূপ যেন এক
কথাকলি ভেসে যায় ছন্দে ছন্দে।

বর্ণময়,
নির্বিকার অথচ চির উচ্ছল, উজ্জ্বল প্রকাশ—

কোষে কোষে প্রাণের বিকাশ ছুঁয়ে যায়
নীলাকাশ—

সর্বব্যাপী এক মহাচল।

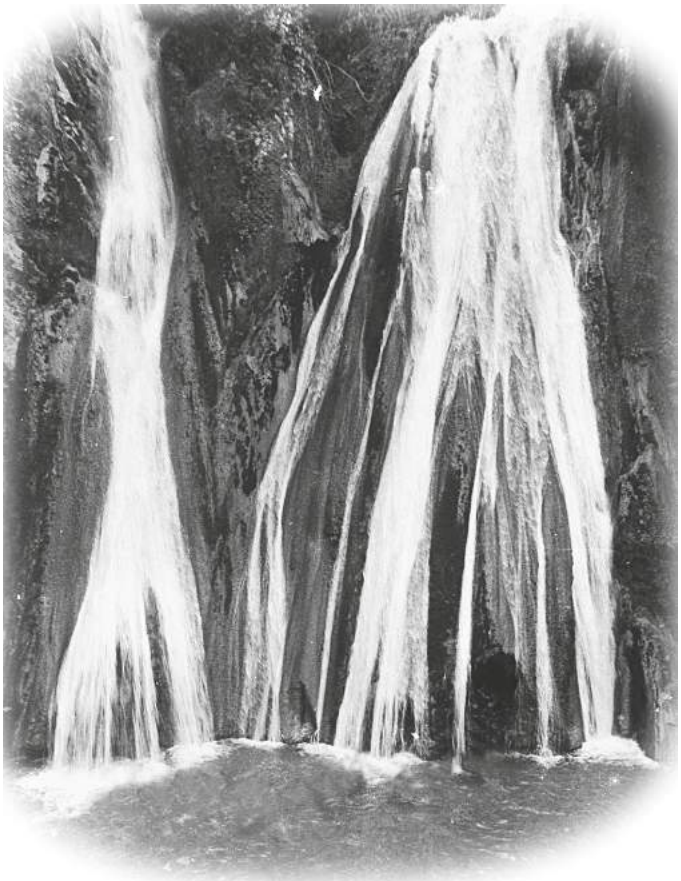

সুনীল শর্মাচার্য

হিমালয়

হিমালয় নিয়ন্ত্রণ করে আবহাওয়া,
হিমালয় ভারসাম্য রাখে যে প্রকৃতির...
এই পর্যন্ত লিখে ভাবি ঃ হিমালয় আছে
বলে—নদী আছে, গাছপালা আছে, পাখিও...
মানুষের বসবাস আছে, আরও আছে
কতো কি! ভাবতে ভাবতে দেখি ঃ পাথরেও
লুকানো আগুন; সভ্যতা পাথরে নতুন!

জগন্ময় মজুমদার

পাহাড়ের ঠান্ডা লাগলে

পাহাড়ের ঠান্ডা লাগলে গার্গল করে
জলপ্রপাত।

সারাবছর লেগেই আছে ঠান্ডা
মানুষ আর কত পারে, উষ্ণতা ছড়ায়।

প্লাসটিকে, পলিথিনে ভিড়ে কোলাহলে
দমবন্ধ হয়ে আসে পাহাড়ের,
ঠান্ডা কাটে না।

উষ্ণ জলপ্রপাতের সঙ্গে হাতে হাত লাগায়
ঝরণা।

যেকোনো পাথর

যে কোনো পাথর
হিমালয়ের অংশ মনে হয়।

পাথরে শেওলা জমে, এবড়োখেবড়ো, পিচ্ছিল গা।

আমি কারু উচ্চতা মাপি না
আমি নই ওক, বার্চ, পাইন বা পপলার
যখন আমার সীমা অসীম আকাশ,
প্রতিদ্বন্দ্বী হিমালয়।

প্রতিদিন সূর্যোদয় হয় শৃঙ্গচূড়ায়
যত ঢাকে বরফে তুষারে মেঘে
বদলায় দিগন্ত বলয়।

নীরবতা যেন স্তরীভূত প্রতিরোধ
গুহামুখে অতন্দ্র সেনানী
মৌন পাহারা দেয় উৎস গোমুখ।

যদি ভাঙে নির্ঝরের স্বপ্ন বা ঘুম
শোনাই রবীন্দ্রনাথ
ভেসে যাই নীল নুড়ি লাল নুড়ি জলপ্রপাতে...

শুভঙ্কর মজুমদার

আলোয় ভুবন ভরা

আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন, পিছনে বেল গবেষণাগারের অ্যান্টেনা

আমার এই কাহিনির আরম্ভ আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে। সালটা ছিল ১৯৬০, দুজন গবেষক আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন গবেষণা করছিলেন মহাকাশের নানান রেডিও সংকেত ও তার উৎপত্তির উপর। কিন্তু মহাকাশের সুদূর প্রান্ত থেকে আসা রেডিও সংকেত-কে ধরার জন্য তাঁদের প্রয়োজন ছিল অতি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যানটেনার। কিন্তু তাঁদের কাছে অত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যানটেনা বানানোর মত অর্থ ছিল না। তাঁরা বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে চিঠি পাঠাতে থাকেন তাদের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে কিন্তু বহু বছর তারা কোন উত্তর পাননি। তখন সমস্ত রেডিও অ্যানটেনাই ব্যবহার করা হত বাণিজ্যিক স্বার্থে। কোন প্রতিষ্ঠানই তাদের অ্যানটেনাকে বিজ্ঞানের মত বিষয় যেখান থেকে কোন অর্থই আসে না সেখানে ব্যবহার করতে রাজি হননি। কিন্তু ১৯৬০-৬২ সাল নাগাদ যখন কৃত্রিম উপগ্রহ নির্ভর যোগাযোগ শুরু হল তখন রেডিও অ্যানটেনার ব্যবহার ধীরে ধীরে কমতে লাগল। সমস্ত বাণিজ্যিক সংস্থা এই কৃত্রিম উপগ্রহ নির্ভর যোগাযোগ-কেই বেশি প্রাধান্য দিতে শুরু করে। সেই সময় বেল ল্যাবরেটরির একটা বিশালাকার উচ্চ শক্তিসম্পন্ন রেডিও অ্যানটেনা বাণিজ্যিক কাজে অবসর নেয়। ব্যস, পেনজিয়াস ও উইলসনের হাতে এসে যায় এক মস্ত সুযোগ। তাঁরা যোগাযোগ করেন বেল গবেষণাগারের সাথে এবং ভাগ্যক্রমে সেই অ্যানটেনাটা ব্যবহারের অনুমতিও তাঁরা পেয়ে যান। সেই অ্যানটেনাকে তারা একটা রেডিও Telescope হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশ থেকে আসা ফিকে হয়ে যাওয়া রেডিও ও মাইক্রোওয়েভ সংকেত-কে ধরা ও তাঁরা কোথা থেকে আসছে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করা। কিন্তু যখনই তাঁরা মহাকাশের থেকে আসা সংকেত-কে ধরার চেষ্টা করলেন, তখনই তাঁরা দেখলেন সেই অ্যানটেনাতে কোন একটা সমস্যা আছে। কারণ তাঁরা দেখলেন যে সংকেত-গুলি ঠিক স্পষ্ট নয়। সংকেত-গুলির মধ্যে একটা State নয়েজ আসছে, যেমন টিভিতে চ্যানেল না থাকলে আসে বা রেডিও সংকেত না পেলে যেমন একটা শব্দ আসে তেমন শব্দ। স্বাভাবিক ভাবেই তারা অ্যানটেনাকে পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে অ্যানটেনার মধ্যে পায়রা বাসা করে আছে। পেনজিয়াস ও উইলসন সেই সব পায়রাদের তাড়িয়ে দেন এবং অ্যানটেনাকে পরিষ্কার করে দেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হল না। সেই নয়েজটা যেমন থাকার তেমন থেকে গেল। এবার তাঁরা যথারীতি বিরক্ত হয়ে গেলেন। তাঁরা ভাবলেন যে, আকাশে এই বিশেষ অংশ থেকে নিশ্চই কোন ডিসটার্বেন্স আসছে যা বাকি সমস্ত সংকেত-কে খারাপ করে দিচ্ছে। পেনজিয়াস ও উইলসন ভাবলেন যে, তাঁরা নিশ্চয়ই কোন সুপার নোভা বা নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁরা যথারীতি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং সেই সংকেত-এর অবস্থান ও দূরত্ব হিসাবের চেষ্টা করেন। যেহেতু পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সেহেতু বছরের এক এক সময়ে পৃথিবীর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সংকেত-এর তারতম্য হতে থাকে। এবং সেই তারতম্যের উপর ভিত্তি করে সেই সংকেত-এর অবস্থান ও পৃথিবী থেকে দূরত্ব হিসাব করা যাবে। কিন্তু তেমন কিছুই হল না। পেনজিয়াস ও উইলসন অবাক হয়ে গেলেন যখন তাঁরা দেখলেন যে সংকেতটা মহাকাশের চতুর্দিক থেকে সমান হারে আসছে। অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থান যাই থাকুক না কেন সংকেত-এর কোন তারতম্য হচ্ছে না। তাদের জীবনের ইতিহাসে এমন ঘটনার সম্মুখীন তারা কখনও হননি। যদি থাকত তাহলে এই সঙ্গে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল পৃথিবীর চারিদিকে একটা সুপার নোভা বা নিউট্রন স্টার। কিন্তু তাতো নেই। তাই এই ঘটনা ঘটা অসম্ভব। এর একটাই কারণ হতে পারে যদি কিনা এই সংকেতটা মহাকাশের নিজের হয়। মহাকাশ নিজেই কি তাহলে কোন সংকেত-কে পাঠাচ্ছে? কিন্তু তা কি হওয়া সম্ভব? পেনজিয়াস ও উইলসন লেগে পড়লেন এর কারণ খুঁজতে। ১৯৬০ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব-এর সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্টেডি স্টেট তত্ত্বের উপর বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এই তত্ত্ব, এই মহাকাশ থেকে আসা মহাকাশের নিজস্ব সংকেত তৈরির বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু সেই সময় কিছু বিজ্ঞানী আরো এক সৃষ্টিতত্ত্বের উপর গবেষণা করেছিলেন। তাদের মতে মহাবিশ্ব স্থির ছিল না এবং তারা বিশ্বাস করতেন যে মহাবিশ্ব একটা সংকেত বিন্দু থেকে তৈরি। তাদের হিসাবে সৃষ্টির আদিকালে ব্রহ্মাণ্ড ছিল প্রচন্ড উত্তপ্ত। সমস্ত পদার্থ ছিল সেই সময় প্লাজমা প্রকৃতির। যেমনটা থাকে যে কোন নক্ষত্রের কেন্দ্রে। পরবর্তীতে বহু লক্ষ বছর পর মহাবিশ্ব ঠান্ডা হয় এবং পদার্থরা সুস্থির পরমাণু গঠন করে। যদি এই তত্ত্ব সঠিক হয় তাহলে যখন মহাবিশ্ব

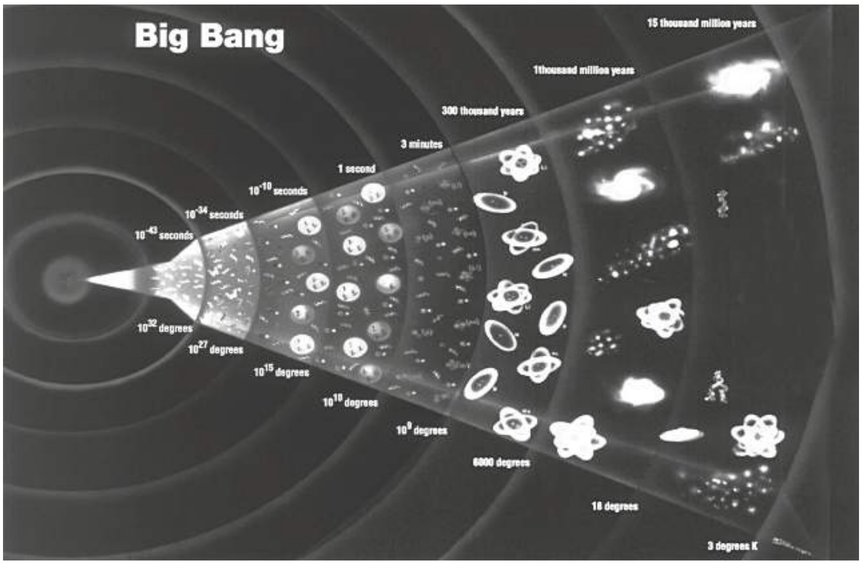

মহাবিস্ফোরণ

প্রচন্ড উত্তপ্ত ছিল তখন তার থেকে আলো তৈরি হওয়া সম্ভব, যাকে বলে 'Left over Radiation from the Big Bang'। কিন্তু ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্বকে কেউই বিশ্বাস করেননি। কিন্তু আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন-এর অ্যানটেনাতে ধরা পড়া সংকেত এই তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁরা এমনি একটা সংকেত-কে ধরার চেষ্টা করছিলেন। যেহেতু এই সংকেতটা মহাবিস্ফোরণ-এর সময় তৈরি তাই এই সংকেতটা মহাবিশ্ব-এর চারিদিকে থেকে পাওয়া উচিৎ, যেমনটা পেনজিয়াস ও উইলসন পেয়েছিলেন। যদিও মহাবিস্ফোরণ -এর সময় এই সংকেত বা রেডিয়েশনটি তৈরি হয় তখন তা ছিল উচ্চ কম্পাঙ্কের গামারশ্মি। কিন্ত কোটি কোটি বছর ধরে মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে এই বিচ্ছুরণের কম্পাঙ্ক কমতে কমতে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে মাইক্রোওয়েভ বিচ্ছুরণ যাকে পেনজিয়াস ও উইলসন তাদের অ্যানটেনাতে নয়েজ হিসাবে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে এই বিচ্ছুরিত রশ্মির নাম দেওয়া হয় Cosmic Microwave Background Radiation বা CMBR। আর এটাই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম আলো। এই আলোতে আলোকিত হয়ে আছে সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব। যদিও এই আলোকে আমাদের মানবচক্ষু দেখতে পায় না, তাই আমাদের আকাশকে অন্ধকার দেখায়। যদি আমরা মাইক্রোওয়েভকে দেখতে পেতাম তাহলে আমাদের রাতের আকাশকেও দিনের মত উজ্জ্বল দেখাত। আর অনেকে মাইক্রোওয়েভ নামটা শুনে ভাবছেন যে, এটা কি রান্নাঘরের মাইক্রোওয়েভ কুকার? তা হলে বলব, হ্যাঁ এটাই সেই মাইক্রোওয়েভ। রান্নাঘরের এই যন্ত্রটি যে ইলেকট্রম্যাগনেটিক ওয়েভকে ব্যবহার করে খাবার গরম করে সেই একই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ রয়েছে আমাদের চারিদিকে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। যদিও তার তাপমাত্রা কম তাই তা আপনার খাবার গরম করতে পারবে না। তবে এই দুটো ওয়েভই একই। আর যা বলছিলাম, এই আলোই রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের কোণায় কোণায়। মাইক্রোওয়েভ Telescope দিয়ে দেখলে মনে হবে সমস্ত জগৎ আলোয় আলোকিত। কোথাও একফোঁটা অন্ধকার নেই, যেন— "আলোয় ভুবন ভরা"

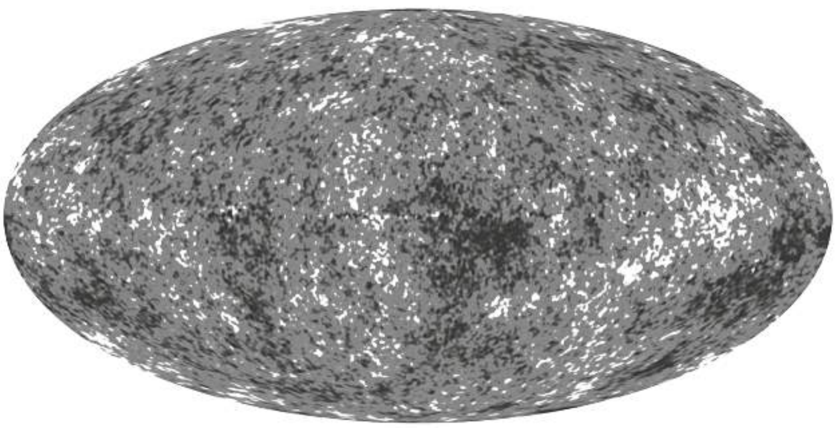

নয় বছরের CMBR চিত্র

email:suvankarmajumder.majumder1993@gmail.com • M. 7001732322

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

স্টুডিও ইউনিক, কাঁচরাপাড়া M. 9332280602 • জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/ 9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায়, বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার, বনগাঁও M. 8637847365, অজয় মজুমদার M. 8918824281 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর, রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • শকুন্তলা মুখার্জী, বনগাঁও M. 8116480129, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ, বামা পুস্তকালয়, M. 9434570130 • অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 • অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 • সারথী চন্দ, শিলিগুড়ি, M. 9674031082 • উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ • শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, M. 9609844676/7908341942 • ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, M. 9635995476 • দীপাঞ্জন দে, কৃষ্ণনগর ও চাপড়া, M. 9734067466 • বহরমপুর রেলওয়ে বুক স্টল ও বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, M. 9474350231

মনেরে আজ কহোরে ১

কমলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

মস্তিষ্কের ঝুল ও ঝাড়ন

বয়স বাড়ার সাথে কিছু পরিমাণ স্মৃতিভ্রংশ স্বাভাবিক হতে পারে। যেহেতু মস্তিষ্কের কোশগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু স্বাভাবিকের বেশি মাত্রায় স্মৃতিভ্রংশ, রোগের প্রাদুর্ভাব ডেকে আনে। এখন এই স্মৃতিভ্রংশই হল Dementia.

প্রাচীন গ্রিক ও রোমান দার্শনিক এবং চিকিৎসকদের মধ্যে এই রোগ ছিল বলে জানা যায়। Dementia-র কোনো বিশেষ কারণ জানা যায়নি। মস্তিষ্কে আঘাত লাগার ফলেও dementia হতে পারে। কিন্তু এই dementia-র জন্য দায়ী মুখ্য কারণ যা অধিকভাবে সর্বজনগ্রাহ্য, সেটি হল অ্যালঝাইমার্স রোগ বা Alzheimers Disease, সেই বিষয়টি আজ আলোচনার বিষয়।

মনোবিদ Alois Alzheimer 1901 সালে প্রথম একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা Anguste. D.-এর ক্ষেত্রে স্মৃতিভ্রংশ লক্ষ করেন। অবশেষে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর 1906 সালে রুগী মারা যাবার পর তিনি এই রোগের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। তাঁর নাম অনুসারে এই রোগের নাম রাখা হয় Alzheimer's Disease. Dementia-র অন্যতম কারণ হিসাবে এখন এই রোগটিকে ভাবা হয়। সাধারণত এটি late onset disease অর্থাৎ রোগটি প্রাপ্তবয়স্ক বা আরো অধিক বয়স হলে দেখা যায়। ষাট থেকে আশি শতাংশই মাঝ- বয়সি বা বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। কোনো পপুলেশনে যারা 65 বছরের উর্দ্ধে তাদের 5-10% এই রোগ দেখা যায় এবং যাদের বয়স 85 বছরের উর্দ্ধে তাদের পয়তাল্লিশ শতাংশের উর্দ্ধে এই রোগ দেখা যায়। শুধুমাত্র স্মৃতিলোপ বা স্মৃতিভ্রংশই নয়, আরো নানা রকমের উপসর্গ দেখা যায় অ্যালঝাইমার্স-এর ক্ষেত্রে। যেমন, রোগী সম্প্রতি কোনো ঘটনা মনে করতে পারে না, কিংবা সঠিক অর্থযুক্ত শব্দ সাজিয়ে কোনো কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। অথবা যা দেখছে তার সঙ্গে স্থানের কোনো সাদৃশ্য তথা সামঞ্জস্য রাখতে পারে না। ধরা যাক কোনো গাড়ি এগিয়ে আসছে, এবার সেটা ঠিক কত দূরে আছে সেটা অনুধাবন করতে পারা না। মনোযোগের অভাবও দেখা যায়। যেরকম গণিতের কোনো সমস্যা সমাধানে মনোযোগ না দেওয়াই প্রধান। এক্ষেত্রে তাদের মনোযোগে অসুবিধা হয়। এরা কোনো abstract তথা বিমূর্ত চিন্তন করতে পারে না। ফলস্বরূপ তাদের ব্যক্তিত্বে এই সবকিছুরই ছাপ ফেলে। এখন সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে সব রকমেরই উপসর্গ দেখা যাবে এরকম কোনো মানে নেই। এক এক জনের ক্ষেত্রে বা ব্যক্তিবিশেষে আলাদা হতেই পারে। এবার আসি কারণে। এই কারণ খোঁজার জন্য অজস্র বিজ্ঞানী তথা গবেষকেরা দিন রাত এক করে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। যেটুকু তথ্য জানা গেছে, সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

অ্যালোয়িস অ্যালজাইমার

প্রথম এবং যে প্রধান কারণ সেটি হল senile plaque (সিনাইল প্ল্যাক) অথবা β-plaque। যার কারণে এই রোগকে senile dementiaও বলা হয়।

Dementia প্রধানত দুই ধরনের। একটি presenile এবং অপরটি senile। 65 বছরের আগের dementia-কে সাধারণত presenile এবং 65 বছরের পরের dementia-কে senile dementia বলে।

এখন এই β-plaque আসলে কী? তার উত্তরে আসা যাক।

অ্যামাইলয়েড প্রিকারসর প্রোটিন (Amyloid precussor protein) বা APP আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের কোশপর্দায় থাকে। APP হল single pass transmembrane protein অর্থাৎ এটি কোশপর্দায় কিছুটা প্রোথিত থাকে এবং এর কিছু অংশ কোষের বাইরেও থাকে। ঠিক এই ছবিটার মত।

এখন এই APP মূলত মস্তিষ্কের স্নায়ুকোশের বৃদ্ধি ও মেরামতিতে সাহায্য করে। কাজ হয়ে যাওয়ার পর এই প্রোটিনের আর দরকার হয় না। তখন α-secretase ও δ-secretase নামে দুই ধরনের উৎসেচক প্রোটিনটিকে নির্দিষ্ট অংশে কেটে একে ভেঙে দেয়। আবার প্রোটিনটি পুনরাবর্তিত হয়ে কাজে লাগে। এখন α বা δ-secretase-এর পরিবর্তে যদি β-secretase APP-কে কর্তিত করে তাহলে কিছু অংশ সঠিকভাবে ভাঙা যায় না, যার ফলস্বরূপ β-plaque হিসেবে ওই APP-র অংশ মস্তিষ্কে জমতে থাকে। যেহেতু এটি insoluble বা দ্রবীভূত হয় না, সেই কারণে কোশের বাইরে Aβ বা amyloid β protein হিসেবে জমতে থাকে। মূলত মস্তিষ্কের grey matter বা ধূসর পদার্থে এই প্ল্যাকগুলি জমতে থাকে। দুই স্নায়ুকোশের মধ্যবর্তী স্থানে এইভাবে প্ল্যাক জমে যাওয়ার কারণে নিউরোনাল সংযোগ সঠিকভাবে স্থাপিত হয় না। যার কারণে স্মৃতি মনে রাখার ব্যাপারে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

Alzheimer রোগের শুধুমাত্র একটা কারণ আলোচনা করলাম। Plaque জমা ছাড়াও রয়েছে Tau protein বা neurofibrillary tangle.

Tau protein হল কয়েকটি (সম্ভবত ছয়টি) দ্রাব্য প্রোটিনের সমষ্টি, যা কোশের কঙ্কাল তন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য দায়ী MAPT বা Microtubule associated protein tau জিনের alternative splicing-এর ফলে তৈরি হয়। এরা মূলত মাইক্রোটিউবিউল (কোশ কঙ্কালতন্ত্রের একটি অংশ)-এর সাংগঠনিক অবস্থা ঠিক রাখে। মূলত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অ্যাক্সনে এটি দেখা যায়। এখন এই tau protein স্নায়ুকোশের ভিতরে পুষ্টি ও অন্যান্য পদার্থ পরিবহনে মাইক্রোটিউবিউলকে সাহায্য করে। কিন্তু এই tau protein যদি কোনো কারণে kinase activation-এর প্রভাবে hyperphosphorylated হয় (kinase phosphate group যুক্ত করে) তাহলে tau-এর মত দেখতে অন্যান্য সুতোর মত অংশের সাথে যুক্ত হয়ে অনেকটা ঝুলের মত গঠন তৈরি করে। এবং এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে microtubule-এর সংগঠন ঠিক থাকে না। যার ফলে পুরো কোশের কঙ্কালতন্ত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার সাথে সাথে এক স্নায়ুকোষ থেকে অপর স্নায়ুকোষের পরিবহনও বিঘ্নিত হয়। এখন এই hyperphosphorylated tau protein-কে neurofibrillary tangle নামে অভিহিত করা হয় যা অ্যালঝাইমার্স রোগের অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। বলা ভালো এটি মার্কার হিসাবে বিবেচিত হয়। ওই জমা সুতোর মত অংশকে paired helical filamentsও বলা হয়ে থাকে। এখনো এই tangle তৈরির প্রকৃত কারণ জানা যায়নি।

এবার যে কারণ নিয়ে আলোচনা করব সেটার শতাংশের দিক থেকে বিচার করতে হলে ১-২ শতাংশ বিচারযোগ্য। কারণ বংশগত ভাবে এটি autosomal dominant অর্থাৎ স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে সবার হতে পারে। এক্ষেত্রে এটি early onset অর্থাৎ অনেক আগেই হতে পারে। কারণ, Amyloid Precursor Protein-এর তৈরির জন্য যে দায়ী জিন অর্থাৎ APP এবং Presenilin ($PSEN_1$ ও $PSEN_2$) জিনের মিউটেশন ঘটে থাকলে সহজেই অ্যালঝাইমার্স আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই মিউটেশন আবার amyloid plaque-এর মধ্যে থাকা amyloid β (Aβ42)-র পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

সুতরাং এই মিউটেশনগুলিকে বলে Familial mutation.

এবার আসব sporadic mutation-এ অর্থাৎ যেটি বংশগত mutation নয়। যেখানে বলছে কোনো পরিবেশগত কারণ জিনের mutation তথা পরিব্যক্তির জন্য দায়ী। সেক্ষেত্রে রোগীর late onset বা অনেক বেশি বয়সে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল Apolipoprotein তৈরির জিনের একটি allele (ভিন্ন রূপ) APOE4 যা এই sporadic AD (Alzheimer's Disease)-এর জন্য দায়ী। Apolipoprotein তৈরির অন্যান্য alleleগুলিও আছে, যেমন E2, E3, E ইত্যাদি। E4 allele-এর পরিব্যক্তিই বেশি পাওয়া গেছে। এখন আমি Apolipoprotein-এর কথা বলছি কেন? APO কোথা থেকে এলো? APO বা Apolipopretein হল একধরনের প্রোটিন যা লিপিডের সাথে যুক্ত থাকে এবং lipoprotein গঠন করে। এরা সাধারণত রক্তে ও সেরিব্রো স্পাইনাল তরলে লিপিড পরিবহন করে। এখন দেখা গেছে এই APO-এর অনেকগুলি ভাগ রয়েছে যেমন APO C, APO D, APO E। এই প্রোটিনগুলির মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেড়ে গেলে বিভিন্ন রকমের রোগ তৈরি হয়। দেখা গেছে APO E-এর পরিমাণ বেড়ে গেলে Dementia ও AD সৃষ্টি হয়। সাধারণত APO E লাইপোপ্রোটিন গ্রাহকগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোলেস্টেরল পরিবহনে অংশ নেয়। এখন যদি কোনো মানুষের APOEe4 অ্যালিলে দুটো মিউটেশন থাকে তাহলে রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এই APO E সাধারণত β-amyloid প্ল্যাকের ভাঙনে সাহায্য করে। কিন্তু যদি e4 allele থাকে তাহলে তারা অতটা সক্রিয়ভাবে

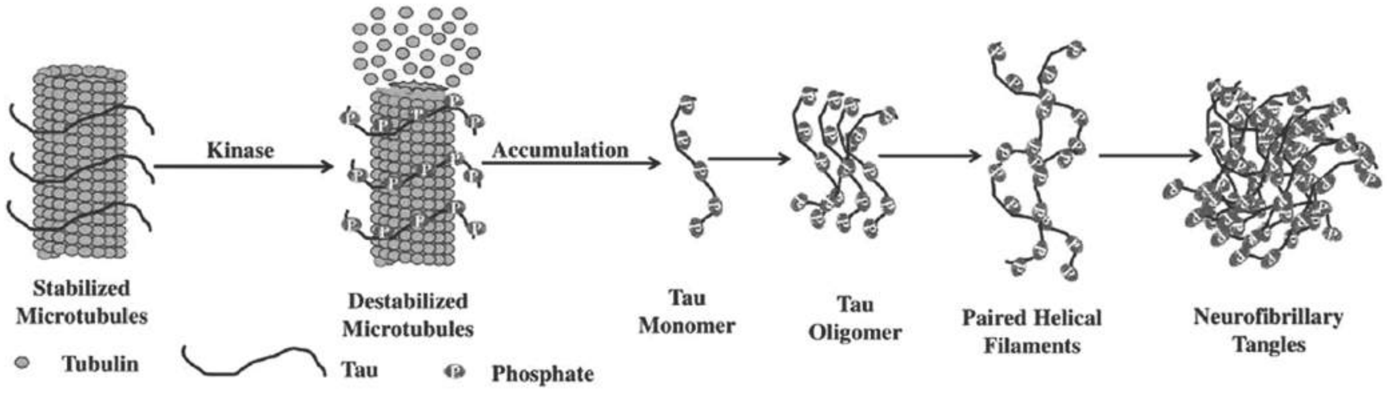

β-plaque-কে ভাঙতে পারে না।

আবার $PSEN_1$ ও $PSEN_2$ gene-এর মিউটেশন হলে δ-secretase-এর অবস্থান বদল করে দেয় যেই কারণে δ-secretase সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না।

এতগুলি কারণে ফলস্বরূপ দেখা যায় মস্তিষ্কের atrophy অর্থাৎ মস্তিষ্ক সংকুচিত হয়ে যায়। মস্তিষ্কের মধ্যে থাকা sulci ও gyri (খাঁজ ও ভাজ)-র দূরত্ব বাড়তে থাকে। এছাড়া মস্তিষ্কের মধ্যে তরলপূর্ণ যে গহ্বর (Ventricles) আছে সেগুলি বড় হতে থাকে।

শুরুতে যে উপসর্গগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে দেখা যায় যে রোগী নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে কিংবা বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। মূলত Brain Biopsy করে মস্তিষ্কের কোশের বিভিন্ন পরিবর্তনগুলি জানা যায়। এবার এই রোগের চিকিৎসার কথায় আসা যাক।

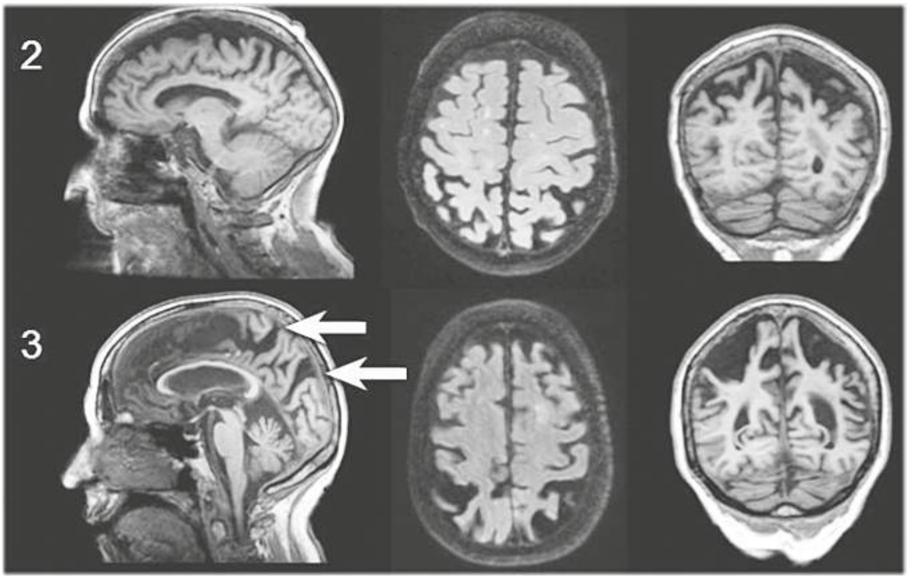

ডিমেনসিয়া আক্রান্তের মস্তিষ্ক সংকোচনের রেডিও চিত্র

সেইভাবে এখনো AD-র চিকিৎসা পদ্ধতি জানা সম্ভবপর হয়নি। তবে দেখা গেছে বিভিন্ন জীবনশৈলী তথা অভ্যাস যেমন ধূমপান AD-র একটি ঝুঁকির উপাদান হিসেবে কাজ করে। যেহেতু Dementia শুধুমাত্র স্মৃতিভ্রংশ নয় তার সাথে বৌদ্ধিক তথা cognitive বা ধারণা করার কার্যকলাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই এখনো অবধি ওষুধ হিসাবে অ্যাসিটাইল কোলিনেস্টারেজ ইনহিবিটর, memantine ইত্যাদি দেওয়া হয়। 2021 সালে আমেরিকায় একটি amyloid beta-directed monoelonal antibody প্রয়োগ করার স্বীকৃত হয়েছে। যেটি Aducanumab (Aduhelm) নামে পরিচিত। এছাড়া Psychotherapy-র মাধ্যমে রোগী কিছুটা হলেও সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

email:kamalinibanerjee842@gmail.com M. 9330029812

অ মি তা ভ চ ক্র ব র্ত্তী

বিষাক্ত রাসায়নিক ও একটি দুর্ঘটনা

করেন ওয়েটারহান

ফিউম হুডের নীচে গবেষণা

১৪ আগস্ট, ১৯৯৬। ডর্টমাউথ কলেজের রসায়ন গবেষণাগারে কাজে ব্যস্ত করেন ওয়েটারহান। তিনি রসায়নের অধ্যাপক এবং টক্সিক মেটাল এক্সপার্ট। একটু সোজা করে বললে অধ্যাপনা ছাড়াও বিভিন্ন বিষাক্ত ধাতু ও তাদের যৌগদের নিয়ে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার অভিজ্ঞতা। একটা ফিউম হুডের নীচে সামান্য পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ পিপেটে ভরছিলেন তিনি। উদ্বায়ী, দাহ্য বা বিষাক্ত পদার্থগুলিকে এক পাত্র থেকে ঢেলে অন্য কোথাও নেওয়ার কাজটি ফিউম হুডের নীচেই করা হয়। এর ফলে গবেষণাগারের পরিবেশে অনেকটাই সুস্থ থাকে। তাছাড়া গবেষকরা কাজ করার সময় সুরক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার করেন বিশেষ গ্লাভস। সবকিছু নিয়ম মেনেই করছিলেন ওয়েটারহান। কিন্তু সেদিন তিনি যখন তরল ডাই-মিথাইলমার্কারি পিপেটে ভরছিলেন অসাবধানতা বশত দু-এক ফোঁটা বর্ণহীন তরল পড়ে যায় গ্লাভসে। এই রাসায়নিকটির ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট ওয়াকিবহাল অধ্যাপক। গবেষণাগারের সুরক্ষা নীতি মাথায় রেখে তিনি তৎক্ষণাৎ গ্লাভস খুলে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিলেন। কিন্তু ওয়েটারহান জানতেও পারলেন না ততক্ষণে কী সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেছে।

করেন ওয়েটারহানের জন্ম ১৯৪৮ সালে নিউইয়র্কের প্লাটসবুর্গে। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানে আগ্রহী। সেন্ট লরেন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি

লাভ করেন ওয়েটারহান। ১৯৭৬ সালে ডর্টমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ওয়েটারহান ছিলেন সেখানে রসায়ন বিভাগের প্রথম মহিলা অধ্যাপক। পরবর্তীতে অ্যাকাডেমিক ডিন হিসাবে প্রশাসনিক দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। নব্বইয়ের দশক থেকেই দেহে বিষাক্ত ধাতুর কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণায় মেতে ওঠেন তিনি। দেহকোষের বিপাকীয় পদ্ধতিতে ক্রোমিয়াম ধাতুর বিষক্রিয়া এবং সেখান থেকে ক্যানসারের সৃষ্টি সংক্রান্ত গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন ওয়েটারহান। স্বামী লিয়ন ও দুই সন্তানকে নিয়ে সুখের সংসার তাঁর।

১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাস। ক'দিন ধরেই শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। সবসময় মাথাধরা ও একটা বমিবমি ভাব। একদিন সত্যি বমি করতে শুরু করেন তিনি। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠল। তিনি ভালোভাবে দেখতে ও শুনতে পারছিলেন না। তাঁর জিহ্বা জড়িয়ে যাচ্ছিল। ইমারজেন্সি রুমে তাঁকে দেখে প্রথমদিকে ডাক্তারবাবুরা কোনো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তারপর সিটি স্ক্যান ও মেরুদণ্ড এবং স্নায়ুতন্ত্রের অন্যান্য পরীক্ষানিরীক্ষা করে তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন ওয়েটারহান মারাত্মক রকমের মার্কারি বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। একজন ডাক্তারবাবু তো ওয়েটারহানের স্বামীর কাছে জানতে চাইলেন অধ্যাপকের কোনো শত্রু আছে কিনা যে ওঁকে প্রাণে মেরে ফেলতে চাইছেন! অবশেষে ওয়েটারহান ডাক্তারবাবুদের জানালেন ডাই-মিথাইলমার্কারি হাতে পড়ে যাওয়ার সেই ঘটনাটি। তখন জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ। শুরু হল চিলেশন থেরাপি। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে এমনকিছু রাসায়নিক পদার্থ ইনজেকশনের মাধ্যমে ওয়েটারহানের শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যেগুলি ক্ষতিকর পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হবে এবং অবশেষে ওঁর দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে।

নব্বইয়ের দশক বিজ্ঞানীরা মার্কারির বিষক্রিয়া নিয়ে ওয়াকিবহাল থাকলেও ডাইমিথাইলমার্কারির ভয়ংকর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে ততটা মাথা ঘামায়নি। তাছাড়া হাতে গোনা কিছু গবেষণা ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি এই রাসায়নিক পদার্থটি। মানবকোষে মার্কারির বিষাক্ততার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বিজ্ঞানীরা যে নিউক্লিয়ার

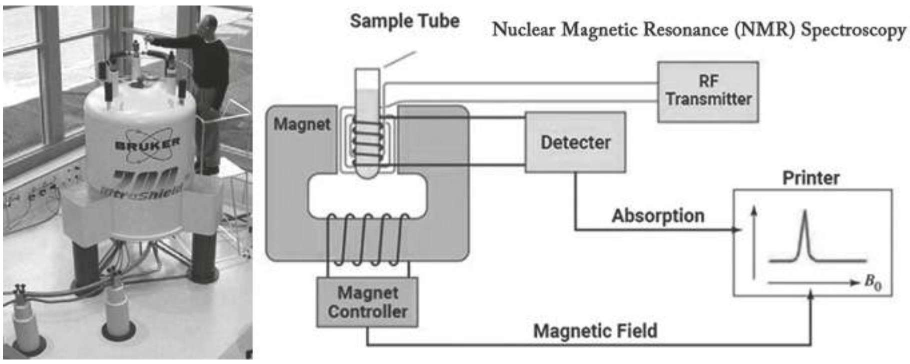

নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স স্পেক্টোস্কোপি ও তার কার্যপদ্ধতি

ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স (NMR) স্পেক্ট্রস্কোপি প্রযুক্তি ব্যবহার করতেন সেখানে রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে ব্যবহার করতেন ডাইমিথাইল-মার্কারি। ওয়েটারহানের গ্লাভসে একফোঁটা ডাইমিথাইলমার্কারি পড়ে যাওয়ার সময়ও তিনি সেই গবেষণার কাজই করছিলেন।

ওয়েটারহানের যখন হসপিটালের বিছানায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন তখন ডর্টমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহকর্মী ও পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকা গবেষকরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ডাইমিথাইল-মার্কারির বিষাক্ততা সম্পর্কিত গবেষণায়। রোগীর চুল থেকে শুরু করে ব্যবহৃত জামাকাপড়, গাড়ি, ছাত্রছাত্রী ও পরিবারের সব সদস্যদের

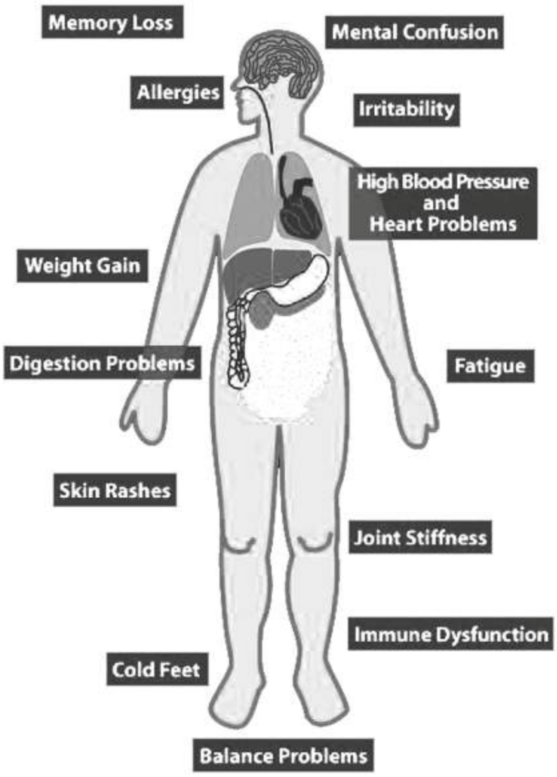

মানবদেহে পারদ বিষাক্ততার প্রভাব

পরীক্ষা করা হল এটা জানতে যে আরও কোথাও ডাইমিথাইলমার্কারির বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পরেছে কিনা। তবে ওয়েটারহানের রক্তে মার্কারির মাত্রা ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৮০০ গুণ। এত বেশি মাত্রার মার্কারিকে দেহ থেকে মুক্ত করা ডাক্তারবাবুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফেব্রুয়ারি নাগাদ কোমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তিনি। অবশেষে জুন ৮,১৯৯৭ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন অধ্যাপক ওয়েটারহান। এই মৃত্যু বিষাক্ত রাসায়নিক নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সময় গবেষকদের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গোটা বিশ্বকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। পরিবর্তন আসে পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত গ্লাভসেও।

তবে এই ঘটনার মূলে মার্কারি পয়জনিং বা পারদ বিষাক্ততা। বিশুদ্ধ মৌল হিসাবেও পারদ খুব বিষাক্ত। দেহের প্রোটিনকে নষ্ট করে দেওয়া থেকে শুরু করে শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রকম উৎসেচকের কাজে বাধা সৃষ্টি করা ছাড়াও মার্কারির দেহের অভ্যন্তরে সাধারণ ক্ষয়কারী প্রভাবও রয়েছে। অথচ আর্সেনিকের মতো এই মৌলটিও প্রাচীনকাল থেকেই মানবসভ্যতায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

email:acnbu13@gmail.com • M. 8967965340

রতন দেবনাথ

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন

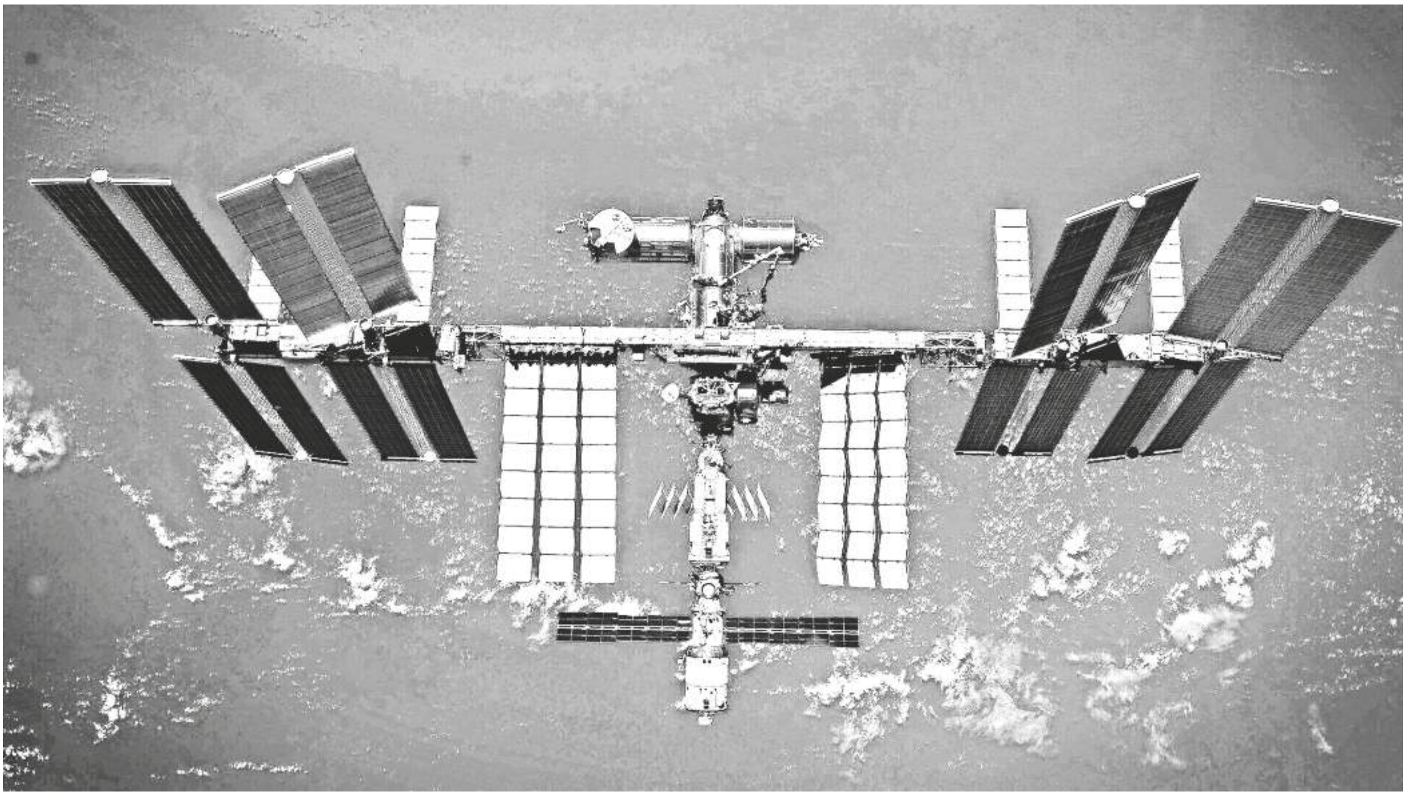

আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগে ইউরি গ্যাগারিন নামের সাতাশ বছরের এক রুশ তরুণ মহাকাশে চক্কর কাটলেন পৃথিবীকে ঘিরে। মহাকাশ যান ভস্তক ১-এ চড়ে মাত্র ১০৮ মিনিট সময় কালের এই মহাকাশ ভ্রমণ রচনা করল এক নয়া ইতিহাস। পৃথিবীর মাটি ছেড়ে এই প্রথম কোন মানুষের মহাশূন্যে পাড়ি জমানো। এটাও প্রমাণ হল মহাকাশে মানুষের বেঁচে থাকাও সম্ভব। তাহলে তো মহাকাশে বানানো যেতে পারে সাময়িক এমন আবাসস্থল যেখানে কিছুদিন মহাকাশচারীরা থাকতে পারে, করতে পারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। মহাকাশে এরকম সাময়িক আবাসস্থলই হল স্পেস স্টেশন বা মহাকাশ স্টেশন।

ভাবনাটা শুরু হয়েছিল আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকারী সংস্থা নাসা-র উদ্যোগে পরিকল্পনা করা হল একটি মহাকাশ স্টেশন তৈরি করার। সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে নেওয়া হল ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সী, কানাডা এবং জাপানকে। পরে সঙ্গী করা হল রাশিয়াকেও। কেননা পরিভ্রমণকারী মহাকাশযানের দুনিয়ায় এই দেশটির অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক। প্রকল্পের শুরু ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে। পৃথিবীর পাঁচটি দেশের পারস্পরিক সহযোগিতায় বাস্তবায়িত এই স্পেস স্টেশনটির নাম আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন।

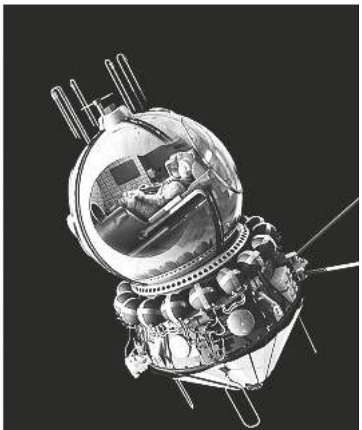

ইউরি গ্যাগারিন ও ভস্তক-১

বিশালাকার মহাকাশ স্টেশন পৃথিবীর মাটিতে তৈরি করে মহাকাশে পাঠানো অসম্ভব ব্যাপার। তাই বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে স্টেশনটির এক একটি অংশকে পৃথিবীতে তৈরি করে ধাপে ধাপে মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে সেখানেই সেগুলোকে জুড়ে জুড়ে তৈরি করে নেওয়া হয় আস্ত এক মহাকাশ স্টেশন। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের প্রথম দেহাংশটি যার নাম জারইয়া কন্ট্রোল মডিউল (স্পেস স্টেশনের এক একটি অংশকে বলে মডিউল) পাঠানো হল কক্ষপথে। রাশিয়ার তৈরি এই অংশটি প্রাথমিকভাবে মহাকাশ স্টেশনের চলবার শক্তি

আহরণ, যোগাযোগ এবং উচ্চতা নিয়ন্ত্রণের কাজটিই করত। দুসপ্তাহ বাদে পাঠানো হল আমেরিকার তৈরি দেহাংশ ইউনিটি মডিউল। স্পেস শাটল এন্ডেভার-এ চেপে ইউনিটি যুক্ত হল রাশিয়ান মডিউল জারইয়ার সঙ্গে। এরপর বছর দুয়েক ধরে একে একে পাঠানো হল আরও বিভিন্ন অংশ। মহাকাশে তৈরি হল পরিভ্রমণরত ঘরের কাঠামো। এবার

বিল শেফার্ডের সাথে ইউরি গিজেঙ্কো (ডান) এবং সারগেই কৃকালেভ

আবাসিক পাঠানোর পালা। ২ নভেম্বর ২০০০ সাল। রাশিয়ান মহাকাশচারী ইউরি গিজেঙ্কো এবং সারগেই কৃকালেভ এবং নাসার এক মহাকাশচারী বিল শেফার্ডকে পাঠানো হল প্রথম আবাসিক হিসাবে। এরপরও সময়ের সাথে সাথে পাঠানো হতে লাগল আরও অংশ। ২০১১ সালে সম্পূর্ণ হল মহাকাশ স্টেশন তৈরির কাজ।

মহাকাশ স্টেশনটির মূল দুটি ভাগ রাশিয়ান এবং আমেরিকান—একটি কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত, যার নাম ট্রাস। ট্রাসই হল মহাকাশ স্টেশনটির মেরুদণ্ড যার সাথে যুক্ত রয়েছে আরও প্রয়োজনীয় অনেক অংশ যার মধ্যে অন্যতম হল সৌরপ্যানেল। সূর্যের আলো থেকে তড়িৎ উৎপাদন করে শক্তির যোগান দেয় মহাকাশ স্টেশনের। এছাড়াও রয়েছে কিছু বিকিরক যা স্পেস স্টেশনের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। রাশিয়ান এবং আমেরিকান এই দুটি ভাগেই রয়েছে পরীক্ষাগার, থাকার ঘর এবং ডকিং পোর্ট। ডকিং পোর্ট হল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে নতুন কোন যান এসে যুক্ত হতে পারে স্পেস স্টেশনটির সঙ্গে। নবাগত মহাকাশচারীরা এই পোর্টের মধ্য দিয়েই ঢোকে মহাকাশ স্টেশনে। ট্রাসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আর একটি অংশ যার নাম কানাডার্ম ২। কানাডায় নির্মিত এই যন্ত্রাংশটি আসলে একটি সুবিশাল ক্রেন। দূর নিয়ন্ত্রিত এই ক্রেনটি বিভিন্ন যন্ত্রাদি এদিক-ওদিক সরানো থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে আসা কোন যন্ত্রাংশ ধরার কাজেও এটির ব্যবহার হয়।

স্টেশনটির আমেরিকান ভাগে রয়েছে আরেকটি মডিউল। জাপানে নির্মিত এই মডিউলটির নাম কিবো। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয় এই অংশটি। এর কাছাকাছিই রয়েছে ট্রাঙ্কুইলিটি মডিউল। ইউরোপে নির্মিত এই মডিউলটিকে মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীর মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এয়ার লক হল স্পেস স্টেশনের দরজা যার মাধ্যমে মহাকাশচারীরা স্পেস স্টেশনের বাইরে বেরুতে পারে স্পেস ওয়াক করতে। ২০১৬ সালে মহাকাশ স্টেশনটির সাথে যুক্ত করা হয়েছে আরেকটি মডিউল।

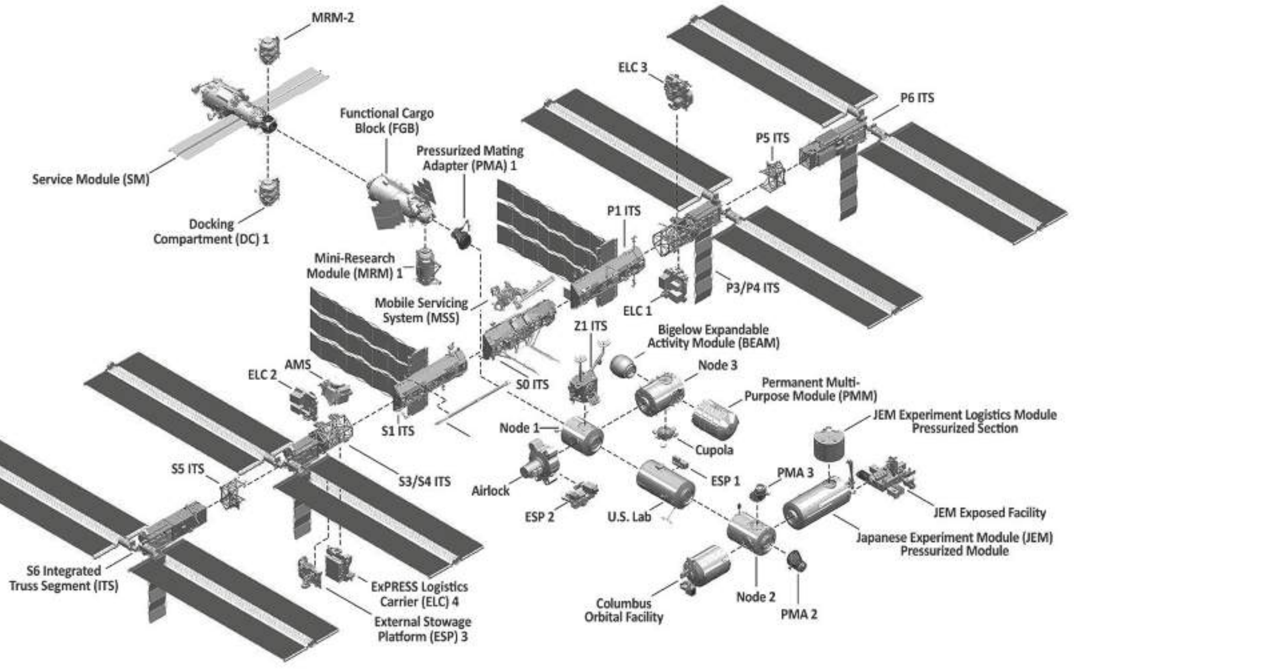

মহাকাশ স্টেশনের বিভিন্ন অংশের সংযুক্তি

বিগেলো এক্সপান্ডেবল অক্সিভিটি নামের এই মডিউলটি ভবিষ্যতে হবে হোটেল এবং ভ্রমণপিপাসু যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা।

পাঁচটি বেডরুম বিশিষ্ট ঘরের সমান আয়তনের বিশালাকার এই স্পেস স্টেশনটি পৃথিবী থেকে প্রায় ২৫০ মাইল গড় উচ্চতায় থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে প্রায় ১৭৫০০ মাইল প্রতি ঘন্টা বেগে। এই হিসাবে এটি প্রতি ৯০ মিনিটে একবার পৃথিবীর চারপাশ ঘুরে আসছে। সীমিত পরিসরের এই স্পেস স্টেশনটিতে অনধিক ছয় জনের থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে। মাঝেমধ্যেই পরিবর্তন হয় আবাসিকের। আসা যাওয়া চলতেই থাকে।

মহাকাশে বসবাস করা ঠিক আমাদের পৃথিবীতে বসবাসের মতো নয়। দুয়ের মধ্যে অনেক ফারাক। মহাকাশে পৌঁছলেই মানব শরীরে ঘটে নানা পরিবর্তন। তাই মহাকাশে থাকতে হলে মানুষকে সামলে নিতে হয় অনেক কিছুই। পৃথিবীতে আমাদের দেহের নিচের অংশ এবং আমাদের পা শরীরের ভার বহন করে। আর এতে আমাদের হাড় এবং পেশী থাকে শক্ত এবং মজবুত। কিন্তু মহাকাশে যেহেতু অভিকর্ষের টান একেবারেই নেই তাই মহাকাশচারীরা ভেসে থাকে শূন্যে। তাই পায়ে ভর করে দাঁড়াবার সুযোগ তাদের থাকে না। তাই তাঁদের শরীরের নিচের অংশ এবং পায়ের জোর কমতে থাকে। হাড়ও হয়ে পড়ে দুর্বল এবং সরু। শারীরিক দিক বিচার করলে এটা তাঁদের পক্ষে খুবই খারাপ। তাহলে এটা তাঁরা সামলায় কি করে। এজন্য তাঁদের প্রতিদিন শরীরচর্চা করতে হয়।

রক্ত এবং হৃদযন্ত্রের পরিবর্তনও ঘটে মহাকাশে। পৃথিবীতে আমরা যখন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই তখন রক্ত আমাদের পায়ে যায়। এসময় শরীরের সারা অংশে রক্ত ছড়িয়ে দিতে হৃদযন্ত্রকে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। মহাকাশে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। এখানে যেহেতু অভিকর্ষের টান একেবারেই নেই তাই রক্ত সহজেই শরীরের উপরের অংশে এবং মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। শরীরের ভিতরকার জলও ঠিক একইভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মহাকাশচারীদের মুখ হয়ে পড়ে তুলতুলে এবং ফোলা ফোলা। রক্ত এবং জল শরীরের উপরের অংশে ছড়িয়ে পড়াতে মস্তিষ্ক ভাবে শরীরে জলের অভাব নেই। তাই মস্তিষ্কের নির্দেশে শরীরের জল উৎপাদনও কমে যায়। তাই মহাকাশ যাত্রা সেরে তাঁরা যখন পৃথিবীতে ফিরে আসেন তাঁদের দীর্ঘদিন বিশ্রামে থেকে শরীরের রক্ত এবং জলের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় নিতে আসতে হয়।

পৃথিবীতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় কিছু সাধারণ কাজ থাকে। যেমন, সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধোয়া, ব্রাশ করা ইত্যাদি। এসবের মধ্য দিয়ে আমারা আমাদেরকে পরিষ্কার রাখি। মহাকাশেও মহাকাশচারীদের নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, চিরুনি এসব কিছুই তাঁদের রয়েছে। তবে পৃথিবীতে আমরা যত সহজে এই কাজগুলো করি মহাকাশে তা অত সহজে করা সম্ভব হয় না। বাড়িতে আমরা বেসিনে হাতমুখ ধুয়ে টাওয়াল দিয়ে মুছে নেই। মহাকাশ স্টেশনে কিন্তু সেরকম কোন বেসিন নেই। এর বদলে তাঁদের একটা ন্যাকড়ায় মুছেই কাজ সারতে হয়।

মহাকাশ স্টেশনে স্নান করাও কিন্তু একটু আলাদা ধরনের। জল নেই বলে তাঁরা ব্যবহার করেন এক বিশেষ ধরনের সাবান এবং শ্যাম্পু। এ ধরনের সাবানে জলের কোনও প্রয়োজন হয় না। স্নান হয়ে গেলে একটা টাওয়াল দিয়ে শুধু গা মুছে নেওয়া। ব্যস্।

সারাদিনের ক্লান্তির পর বিশ্রামের সবচেয়ে বড় উপায় হল ঘুম। পৃথিবীতে আমরা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে নিই। কোনো ঝামেলাই নেই। কিন্তু স্পেস স্টেশনে ঘুমের ব্যাপারটা পৃথিবীর থেকে একটু আলাদা। অভিকর্ষের টান যেহেতু নেই তাই মানুষ সেখানে ভরশূন্য। তাই শুয়ে পড়তে পারে যেখানে সেখানে। তবে একটা কাজ করতেই হবে। সেটা হল নিজেকে বেঁধে নিয়ে শোওয়া যাতে ভেসে না থাকে বা কোন কিছুর সঙ্গে ঠোকর না খায়। সাধারণত মহাকাশচারীরা সেখানে নিজেদেরকে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে কেবিনের দেওয়ালে নিজেকে আটকে রেখে ঘুমোয়।

মানুষের বেঁচে থাকতে হলে যে দুটি জিনিস অবশ্যই প্রয়োজন তা হল পানের জল এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন। মহাকাশ স্টেশনে এ দুটি জিনিসের প্রয়োজন মেটানো হয় কিভাবে? অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এ দুটি বিষয়ের উপর নজর দিয়ে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। তা হল পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়া। মহাকাশচারীদের প্রস্রাবের প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সেখান থেকে পুনরায় পানযোগ্য জল তৈরি করে তাই ব্যবহার করা হয়। আবার এই জল থেকেই তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করে তা কাজে লাগানো হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন বিজ্ঞানের এমন এক গবেষণাগার যে গবেষণা পৃথিবীতে বসে সম্ভব নয়। অভিকর্ষহীন মহাকাশে মানুষ কিভাবে থাকতে পারে তারই তালিম নিতে মহাকাশ স্টেশনে বাস। মহাকাশীয় পরিবেশ মানব শরীরের উপর কি প্রভাব ফেলে তারই শিক্ষা নেওয়া। ভবিষ্যতে সুদূর মহাকাশে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে নাসার। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন তাঁরই প্রথম পদক্ষেপ। স্পেস স্টেশনের এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মহাকাশচারীদের গড়ে তোলা হবে দূরের আরও দূরের মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার উপযোগী করে।

email: rdebnath1961@gmail.com • M. 9477934928

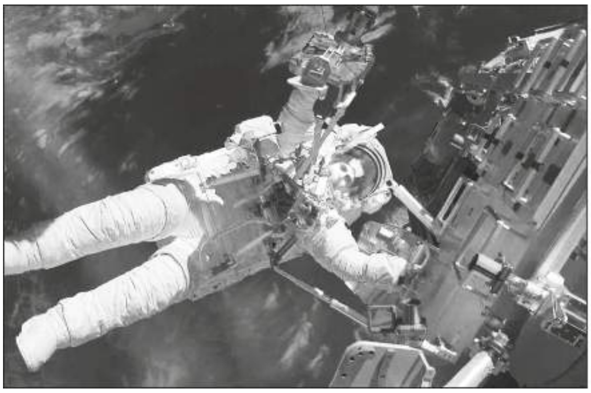

স্টেশনের বাইরে পায়চারি ও মেরামত পর্ব

স্নান পর্ব

দৈনিক শরীর চর্চা